কাকাবাবু সমগ্র

সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. সন্তু তার কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছে.......................... 2
২. জোজোর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না......................... 1 8
৩. চাঁদের কণা 3 2
৪. বেতলার ফরেস্ট বাংলো 4 8
৫. সেই জমকালোভাবে সাজানো ঘরটি 6 5
৬. সকালটা বেশ সুন্দর 8 3
৭. ডালটনগঞ্জের সার্কিট হাউস 1 0 0
৮. কাঠমাণ্ডু শহর একেবারে নিঝুম....................................1 1 6

১. সন্তু তার কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছে

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু তার কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় জোজো এসে হাজির। সন্তু তার ভুরু দুটো অনেকখানি ওপরে তুলে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল। অবাক হওয়ার মতনই ব্যাপার। জোজো সাঙ্ঘাতিক ঘুমকাতুরে। সাড়ে আটটা-নটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেই না।

সে এই সাত সকালে ছুটে এসেছে কেন?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কি রে, বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে নাকি?

জোজো বলল, বিপদ? আমাদের কক্ষনো কোনও বিপদ হয় না। কোনও বিপদকে আমরা বিপদ বলে গ্রাহ্যই করি না। আমার বাবা তো সব আগে থেকেই টের পেয়ে যান। একবার কী হয়েছিল জানিস? আমরা বেড়াতে গেছি বোমডিলা। ডিসেম্বর মাস, দারুণ শীত। বোমডিলা জায়গাটার বিশেষত্ব হচ্ছে, ওখানে কোনও মশা-মাছি নেই। তবু দ্বিতীয় দিন রাত্তিরে বাবা বললেন, আমাকে মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে। ওখানে মশারি পাওয়া যায় না, কখনও দরকারই হয় না। তবু বাবা জোর করতে লাগলেন, অতিকষ্টে একটা মশারি জোগাড় হল। সেটা আমার বিছানায় টাঙিয়ে দেওয়া হল। তারপর কী হল বল তো?

সন্তু হাসল। সকালবেলাতেই জোজোর কল্পনাশক্তি বগাছাড়া ঘোড়ার মতন ছুটতে শুরু করেছে। এসব শুনতে সন্তুর ভালই লাগে।

সন্তু বলল, আমি কী করে জানব?

জোজো চোখ বড় বড় করে বলল, সকালবেলা দেখি যে সেই মশারির ওপরে একটা বিষাক্ত সাপ। ফণা তুলে বসে আছে। মশারি না টাঙালে সেটা নির্ঘাত আমাকে ঘুমের মধ্যে ছোবল মারত। বাবা আগে থেকেই জেনে গিয়েছিলেন।

সন্তু বলল, খুব শীতের মধ্যে বিষাক্ত সাপ বুঝি ফণা তুলতে পারে?

জোজো বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলল, বোমডিলার সাপগুলো যে আলাদা, জাতের, তা তুই জানিস না বুঝি? ওরা কালনাগিনীর বংশধর!

সন্তুর কুকুরটা ছটফট করছে। প্রত্যেকদিন এই সময় ওর পার্কে গিয়ে দৌড়নো অভ্যেস। সাদা ধপধপে কুকুর। ওর নাম রকুকু। সন্তু কখনও ওকে চেন দিয়ে বাঁধে না।

রকুকু লাফিয়ে লাফিয়ে সন্তুর জামা ধরে টানছে। বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাস্তায় পা দিয়ে সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, তা হলে মহাশয়ের এই অসময়ে আগমনের কারণ কী তা জানতে পারি?

জোজো বলল, একটা মুশকিলে পড়ে গেছি। পিন হেড মাশরুম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস, সন্তু?

পিন হেড মাশরুম, সে আবার কী জিনিস?

সকাল সাতটার মধ্যে জোগাড় করতেই হবে। না হলে ব্রেকফাস্টের টাইম পেরিয়ে যাবে। তারপর আর উনি কিছু খাবেন না!

উনি মানে কিনি?

সাইমন বুবুম্বা। তিনি তো আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন, কাল সন্ধেবেলা থেকে। চুপ, কাউকে যেন বলিসনি। খুব গোপন ব্যাপার।

কাকে বলব! উনি কে তাই-ই তো আমি জানি না।

তুই সাইমন বুবুম্বার নাম শুনিসনি? আফ্রিকার একটা খুব বড় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ওঁর এত ক্ষমতা যে গাদ্দাফি আর সাদ্দাম হোসেনকে যখন-তখন ধমক দিতে পারেন। আফ্রিকার ওই দেশটায় সোনার খনি আছে তো, তাই টাকা-পয়সার শেষ নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের একটাই দুঃখ, তাঁর কোনও ছেলে নেই। তাই আমার বাবার কাছে এসেছেন কুষ্ঠি দেখাতে। ওঁর তো এমনিতেই সাতাশটা বউ। আর একটা বিয়ে করলে ছেলে হবে কি না জানতে চান।

সন্তু শুনেছে যে, জোজোর বাবা একজন খুব বড় জ্যোতিষী। পৃথিবীর বড় বড় বিখ্যাত লোকেরা নাকি তাঁর কাছে হাত দেখাতে আর ভাগ্য গণনা করতে আসেন। সন্তু অবশ্য তাঁদের একজনকেও এ-পর্যন্ত চোখে দেখেনি।

সন্তু বলল, আফ্রিকার একটা দেশের প্রেসিডেন্ট গোপনে এসে তোদের বাড়িতে রয়েছেন, এই তো! তার জন্য তোকে সকালবেলায় ছুটোছুটি করতে হবে কেন?

জোজো বলল, ওই যে বললুম পিন হেড মাশরুম! প্রেসিডেন্ট সাহেব ব্রেকফাস্টের সময় চারখানা ডিমের ওমলেট ছাড়া কিছু খান না। সেই ওমলেটে থাকবে রসুন আর মাশরুম। তাও যে-কোনও মাশরুম হলে চলবে না।

মাশরুম বুঝি অনেক রকম হয়?

হয় না? একরকম হয় ছাতার মতন। তাই বাংলায় এর নাম ব্যাঙের ছাতা। আর একরকম আছে কোটের বোতামের মতন, তার নাম বাটুন মাশরুম। আর একরকম খুবই ছোট, আলপিনের ডগার মতন। প্রেসিডেন্ট সাহেব সেই মাশরুম ছাড়া খাবেন না।

সে কি আমাদের দেশে পাওয়া যায়?

বাবা তো বলে বসলেন, হ্যাঁ পাওয়া যায়। আমাকে বললেন, যা খুঁজে নিয়ে আয়।

কোথায় খুঁজবি?

একবারটি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস কর না। উনি নিশ্চয়ই জানেন। কাকাবাবু সব জানেন।

দুঃখিত, জোজো। এই সময়ে আমি কাকাবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করতে পারব না। কোন দোকানে কী পাওয়া যায়, কাকাবাবু সেসব খবর কিচ্ছু রাখেন না। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, সুন্দরবনের মধু কোথায় পাওয়া যায় রে, নিউ মার্কেটে?

ঠিক বলেছিস, নিউ মার্কেট! ওখানে নাকি বাঘের দুধ, হাতির দাঁত, ময়ূরের পালক, হরিণের শিং, সব পাওয়া যায়। তা হলে কি আর সবরকম ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যাবে না? চল সন্তু, চট করে একবার নিউ মার্কেট ঘুরে আসি।

রকুকু অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল, সন্তু শিস দিয়ে তাকে কাছে ডাকল।

তারপর বলল, আমি রকুকুকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, এখন নিউ মার্কেট যাব কী করে? তা ছাড়া এত সকালে কি নিউ মার্কেট খোলে?

জোজো বলল, ট্রাম চলতে শুরু করেছে, আমরা ট্রামে যাব। এইসব দোকান ভোরবেলাতেই খুলে যায়।

সন্তু তবু অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, কুকুর নিয়ে ট্রামে উঠতে দেবে না।

জোজো বলল, আলবাৎ দেবে! এখন বেশি ভিড় হয় না।

তারপর সন্তুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, কেন তোর সাহায্য চাইছি, জানিস? আমার পেছনে স্পাই ঘুরছে। ওই দ্যাখ না বড় রাস্তার মুখে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, কেন, তোর পেছনে স্পাই ঘুরবে কেন?

জোজো বলল, প্রেসিডেন্ট বুবুম্বা সাহেবের যে অনেক শত্রু। তারা এ-পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব যে কোথায় উঠেছেন, তা এরা এখনও জানে না।

সন্তু দূরের লোকটির দিকে একবার তাকাল। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে একজন বড় গোঁফওয়ালা লোক একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে বাঙালি বলে চেনা যায়। আফ্রিকার একজন প্রেসিডেন্টের জন্য বাঙালি স্পাই কেন জোজোর পেছনে ঘুরবে তা বুঝতে পারল না সন্তু। তবে, জোজোর কথা সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারল না। এত ভোরে কষ্ট করে উঠে এসে কি জোজো নিছক একটা মিথ্যে গল্প বানাবে?

ওরা এগিয়ে গেল ট্রাম স্টপের দিকে।

ঠন-ঠন করতে-করতে একটা ট্রাম এল একটু বাদেই। যাত্রী মাত্র কয়েকজন। গত দুদিন খুব বৃষ্টি হওয়ার দরুন এই গ্রীষ্মকালের সকালেও শীত-শীত ভাব আছে বলে বেশি লোক রাস্তায় বেরোয়নি।

রকুকুকে কোলে তুলে নিয়ে ট্রামে উঠে পড়ল সন্তু আর জোজো। সেই গোঁফওয়ালা লোকটিও উঠল ওদের পেছন পেছন।

জোজো সন্তুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করল।

সন্তু ভাবল, এমনও তো হতে পারে, লোকটি ট্রামের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ওরা বসতে না বসতেই ট্রাম-কন্ডাক্টর কাছে এসে বলল, এ কী, না, না। কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না।

জোজো বলল, আমরা কুকুরেরও টিকিট কাটব।

কন্ডাক্টর বলল, টিকিট কাটতে হবে না। তোমরা নেমে যাও!

অন্য যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে রকুকুকে দেখছে।

গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, যাক না। বেশ তো সুন্দর কুকুর।

কন্ডাক্টর বলল, চলবে না। নেমে পড়ো। আমি কুকুর দেখলেই ভয় পাই। একবার আমাকে কুকুর কামড়েছিল, আর চোদ্দটা ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল।

সন্তু বলল, আমার কুকুর অকারণে কাউকে কামড়ায় না!

এই সময় রকুকু ছটফটিয়ে সন্তুর কোল থেকে নেমে পড়ল লাফিয়ে। তারপর সে চলন্ত ট্রামের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

কন্ডাক্টরটি একটা সিটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে, ভয়ে চোখ কপালে তুলে চ্যাঁচাতে লাগল, ওরে বাবা, আমাকেই কামড়াবে, আবার চোদ্দটা ইঞ্জেকশান!

সন্তু আর জোজো সিট ছেড়ে ধরবার চেষ্টা করল রকুকুকে। গোঁফওয়ালা লোকটাও জিভ চুকচুক করে বলতে লাগল, আয় আয়, এদিকে আয়–

কেউ রকুকুকে ধরতে পারছে না, সে ফুড়ত-ফুড়ত করে পালিয়ে যাচ্ছে। সিটের তলায় ঢুকে পড়ল। সব যাত্রীরা তটস্থ!

রকুকু একবার কন্ডাক্টরটির সামনে এসে মুখ তুলে ভুক-ভুক করে ধমকের সুরে ডাকল, যেন তাকে অপমান করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

তারপর রকুকু আবার দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে এক লাফে নেমে পড়ল রাস্তায়।

জোজো ট্রাম থামাবার জন্য জোরে-জোরে বেল বাজাতে লাগল। তার মধ্যেই সন্তু লাফিয়ে পড়েছে। আছাড় খেতে খেতে কোনও রকমে সামলে নিয়ে সন্তু শিস দিয়ে ডাকল, রকুকু, রকুকু!

অমনই বেশ শান্তশিষ্ট ভাবে রকুকু সন্তুর কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

ট্রামটা একটু দূরে থেমেছে। সেখান থেকে জোজো ছুটে এসে হাসিমুখে বলল, খুব ভাল হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। রকুকু আমাদের বাঁচিয়ে দিল।

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

স্পাইটা নামতে পারেনি! ও আর আমাদের পিছু ধরতে পারবে না!

ও লোকটা সত্যিই স্পাই ছিল?

আলবাৎ! দেখলি না। রকুকুকে ধরবার চেষ্টা করছিল!

স্পাইরা বুঝি কুকুর ধরতে যায়? যাক গে যাক! কিন্তু এখন নিউ মার্কেট অবধি যাওয়া যাবে কী করে? হেঁটে যাওয়া যাবে না। অনেক দূর।

তুই কুকুরটাকে বাড়িতে রেখে চলে এলে পারতি, সন্তু!

রকুকু রোজ সকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়। ওকে নিয়ে না গেলে ও ডেকে ডেকে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিত।

তা হলে এক কাজ করা যাক। ওই দ্যাখ একটা দোতলা বাস আসছে। ওকে লুকিয়ে কোলে নিয়ে আমরা একেবারে দোতলায় উঠে যাব। কন্ডাক্টর দেখতে পাবে না। আর যদি দেখতেও পায়, তার সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমরা চলে যাব অনেকখানি। তারপর নেমে পড়ে আমরা আর একটা বাসে। উঠব।

কিন্তু রকুকু যদি বাসের দোতলা থেকে ঝাঁপ দেয়?

এবার ওকে শক্ত করে ধরে থাকব। ওই যে বাস এসে পড়েছে, চল, চল, উঠে পড়ি।

ভোরবেলা প্রথমে ট্রাম চলে। বাস বেরোতে দেরি হয়। কিন্তু একটা দোতলা বাস সত্যিই চলে এসেছে সকাল-সকাল। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তার অনেকের গায়েই সোয়েটার বা শাল জড়ানো। নরম-নীল আকাশ। এখনও ধুলো-ময়লা উড়তে শুরু করেনি, এই সময় কলকাতা শহরটাকে বেশ ভালই দেখায়।

বাস থামতেই রকুকুকে সোয়েটারের মধ্যে চাপাচুপি দিয়ে ওরা দুজনে উঠে গেল দোতলায়। বসল গিয়ে একেবারে সামনে, জানলার কাছে। রকুকুকে রাখল দুজনের মাঝখানে। ওদের পাশের সিটটাতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। ওদেরই বয়েসী আর একটা ছেলে। তার চোখে গোল চশমা।

সন্তু আর জোজো দুজনেই রকুকুকে চেপে ধরে রাখলেও রকুকু ওই অবস্থায় থাকতে রাজি হবে কেন? সে ছটফটিয়ে দুবার ভুক-ভুক করে ডেকে উঠল!

পাশের সিটের ছেলেটি চোখ গোল-গোল করে এদিকে তাকাল।

জোজো বলল, ওঃ কী শীত, ভররর! ভররর!

রকুকু আরও দুবার ডেকে উঠল।

জোজো বলল, সন্তু, তুই সেই গানটা জানিস, হেমো গয়লার গান...। উত্তর পাওয়ার আগেই সে নিজে গানটা গেয়ে উঠল :

হেমো গয়লার ছিল যে এক চাষাবাড়ি
চাষা-বাড়ি- ই- ই- ই
সেথায় ছিল মস্ত বড় একটা কুকুর পাল
হেথায় করে ঘেউ ঘেউ, হোথায় করে ভুক ভুক
হেথায় ঘেউ, হোথায় ভুক
ভুক ভুক ভুক ভুক ভুক

হেমমা গয়লার ছিল যে এক...

গানটা শেষ হতেই পাশের সিটের চশমা-পরা ছেলেটা এক গাল হেসে বলল, তোমরা বুঝি একটা কুকুর লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে না বলতে যাচ্ছিল, সন্তু বলল, হ্যা! ধরা পড়ে গেলি রে, জোজো। তোর গানটা কোনও কাজে লাগল না।

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, আমিও রোজ নিয়ে যাই। এই দ্যাখ না!

গায়ের চাদর সরিয়ে সে একটা সুন্দর, ছোট্ট কুকুর দেখাল। সেই কুকুরটা কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল।

অন্য কুকুরের সাড়া পেতেই রকুকু পিঠ উঁচু করে বেরোবার চেষ্টা করে ডেকে উঠল ভু-ভু-ভু-ক! ভু-ভু-ভু- ক!

দুটো কুকুরে শুরু হয়ে গেল ডাকাডাকি প্রতিযোগিতা।

পেছন দিকের একজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, এ কী, বাসের মধ্যে এত কুকুরের ডাক শুরু হয়ে গেল কী করে? সক্কালবেলা একটু নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম করারও উপায় নেই!

আর একজন যাত্রী বলল, বাড়িতে কুকুর, রাস্তায় কুকুর, আবার বাসের মধ্যেও কুকুর? ওঃ, আর পারা যায় না!

কন্ডাক্টর নীচে ছিল, এবার উঠে এল ওপরে। একেবারে সামনের দুটো সিটের মাঝখানে গাট হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কী, ব্যাপারটা কী?

কুকুর দুটোকে আর গোপন করার উপায় নেই। তারা ডেকেই চলেছে!

পেছনের দুজন যাত্রী বলল, ও কন্ডাক্টর দাদা, নামিয়ে দিন, ওদের নামিয়ে দিন?

কন্ডাক্টর বলল, হ্যাঁ, কুকুর নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই! নেমে যেতে হবে।

জোজো বলল, নিয়মটা কোথায় লেখা আছে, একবার দেখান তো!

কন্ডাক্টর বলল, নিয়ম দেখাতে হবে? তার আগে কুকুরটা দেখি তো ভাল করে?

নিচু হয়ে রকুকুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, বাঃ, এ তো ভাল জাতের কুকুর। কী সুন্দর। আমার নিজের দুটো কুকুর আছে।

তারপর সন্তুর চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কত দূর যাবে ভাই?

সন্তু বলল, নিউ মার্কেট।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অন্য যাত্রীদের শুনিয়ে বলল, না। কুকুর নিয়ে তো বাসে চাপা যায় না। আচ্ছা ভাই, তোমাদের এই কুকুরটার বয়েস কত?

সন্তু বলল, আড়াই বছর।

কন্ডাক্টর বলল, ওঃ, বাচ্চা কুকুর! আমাদের নিয়ম হচ্ছে চার বছর বয়েস ছয়ে গেলে সে কুকুরকে বাসে তোলা যায় না। তার কম বয়েস হলে কোলে দুরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, কুকুরটা লম্বায় কতখানি?

সন্তু কখনও মেপে দেখেনি, আন্দাজে বলল, এক ফুটের মতন হবে!

কন্ডাক্টর বলল, বাঃ, দেড় ফুট হয়ে গেলে সে কুকুর নট অ্যালাউড। এক ফুট পর্যন্ত চলতে পারে।

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, আমার কুকুর তার চেয়েও ছোট। বয়েস মাত্র দেড় বছর! আর দশ ইঞ্চি হাইট।

কন্ডাক্টর বলল, তা হলে তোমরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। এত ছোট তো কুকুর হয় না, কুকুরের বাচ্চা!

জোজো চেঁচিয়ে বলে উঠল, ঠিক, ঠিক। আমার বড়মামা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, তাঁর কাছ থেকে আমি আগেই জেনে নিয়েছি।

পেছন থেকে একজন রাগী গলায় বলল, এ রকম অদ্ভুত নিয়ম আমরা তো কখনও শুনিনি। এক ফুট কুকুর তোলা যাবে আর দেড় ফুট তোলা যাবে না! যত সব বাজে কথা।

আর-একজন বলল, এই যে কন্ডাক্টর দাদা, কুকুর সুষ্ঠু ওদের নামিয়ে দিন।

কন্ডাক্টর বলল, আমাকে তো নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মের বাইরে আমি যেতে পারি না!

রাগী লোকটি বলল, ঘোড়ার ডিমের নিয়ম! কুকুরের বয়েস বোঝা যায় নাকি? আমি যদি বলি, ওই কুকুরটার বয়েস তিন বছর নয়, দশ বছর!

চশমা-পরা ছেলেটি বলল, খবদার, আপনি আমার কুকুরের বয়েস বাড়াবেন না।

জোজো বলল, আমার ছোটকাকা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। তিনি এই নিয়ম বানিয়েছেন। আপনি ঘোড়ার ডিমের নিয়ম বলে তাঁকে অপমান করতে পারেন না!

অন্য একজন বলল, এই যে একটু আগে বললে তোমার বড় মামা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার? এর মধ্যে সে ছোটকাকা হয়ে গেল?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, আমার বড় মামাকে তাঁর পাড়ার ছেলেরা ছোটকাকা বলে ডাকে, তাই আমিও মাঝে-মাঝে বলে ফেলি!

কন্ডাক্টর হাত তুলে বলল, আস্তে আস্তে! আপনারা একটু চুপ করে বসুন। নীচের তলায় আমার পার্টনার আছে, তার কাছ থেকে আমি ভাল করে নিয়মটা জেনে আসছি।

কন্ডাক্টর ধুপধাপ করে নেমে গেল নীচে।

কয়েকজন যাত্রী রাগে গজগজ করতে লাগল। কিছু যাত্রী এ সব ব্যাপারে মাথা না গলিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। জোজো আর। চশমা-পরা ছেলেটি হাসতে লাগল মিটিমিটি। দু দিকের দুটো কুকুর ভুক-ভুক আর কুঁই কুঁই করে ডেকেই চলল!

কন্ডাক্টর আর আসেই না!

সেই রাগী যাত্রীটি কিছুক্ষণ পরে অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল ও কন্ডাক্টর দাদা, কী হল, আপনার পার্টনারকে খুঁজে পাচ্ছেন না?

কন্ডাক্টর আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে বলল, হ্যাঁ। ওদের নেমে যেতে হবে। নেমে যাও ভাই তোমরা। নিউ মার্কেট এসে গেছে। নিউ মার্কেট!

জোজো আর সন্তু রকুকুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে রাগী লোকটির দিকে এক ঝলক হাসি ছুড়ে দিল জোজো।

সন্তু কন্ডাক্টরকে বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! চশমা-পরা ছেলেটিও নেমে এসেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। সে বলল, আমিও এই কাছেই একটা বাড়িতে যাব।

সন্তু আর জোজো নিউ মার্কেটের কাছে এসে দেখল সব বন্ধ। মেইন গেটে তালা। শুধু বাইরের দিকের এক কোণে কয়েকটা ফুলের দোকান খুলেছে।

জোজো বলল, যাঃ, কী হবে? আমাকে যে সাতটার মধ্যে জিনিসটা নিয়ে পৌঁছতেই হবে?

সন্তু বলল, তা হলে চল ওই ফুলের দোকানগুলোতে জিজ্ঞেস করি। ওরা হয়তো বলতে পারবে, পিন হেড মাশরুম কোথায় পাওয়া যায়।

জিনিসটা সরু-সরু দেশলাই কাঠির মতন। কচ কচ করে কাঁচাই চিবিয়ে খেতে হয়।

তুই খেয়েছিস?

বাবার সঙ্গে যেবার আফ্রিকা গিয়েছিলাম, তখন কত খেয়েছি। ওগুলো খেলে গায়ে দারুণ জোর হয়। সেইজন্যেই তো আমি এক ঘুষিতে একটা নারকোল ফাটিয়ে দিতে পারি।

পারিস?

তুই একটা নারকোল নিয়ে আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি?

এই সকালবেলা আমি নারকোল কোথায় পাব, জোজো?

ঠিক আছে, তোর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রইল, সন্তু। তোকে আমি নারকোল ফাটিয়ে দেখিয়ে দেব।

সন্তু ফুলের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল।

এত সকালেই এরা এত ফুল কী করে জোগাড় করে কে জানে! দোকান ভর্তি নানারকম ফুল। কতরকম গোলাপ! উঁই, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম। আরও এমন ফুল আছে, সন্তু সেগুলোর নাম জানে না। দুজন লোক বড় বড় বালতি ভর্তি জলে ফুলগুলো ডোবাচ্ছে, কাঁচি দিয়ে ডাল ছাঁটছে, আর একজন রং-তুলি নিয়ে লাল গোলাপকে বেশি লাল করছে।

এখনও গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেনি, নিউ মার্কেটের সামনেটা একেবারে ফাঁকা। রকুকু মনের আনন্দে সেখানে ছোটাছুটি করতে লাগল।

সন্তু একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কাছে ব্যাঙের ছাতা আছে?

দোকানদারটি গম্ভীরভাবে বলল, এটা ছাতার দোকান নয়, ফুলের দোকান।

সন্তু বলল, আমি ছাতা বলিনি। ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙের ছাতাকেও একরকম ফুল বলা যেতে পারে।

দোকানদারটি মুখ ভেংচি কেটে বলল, মোটেই না! এঃ, সক্কালবেলা ব্যাঙের ছাতার নাম শুনলেই খারাপ লাগে!

জোজো বলল, আর একটা ফুলগাছের নাম বাঁদরলাঠি!

দোকানদারটি বলল, এখান থেকে যাও তো ভাই, বিরক্ত কোরো না।

জোজো ওপরের দিকের এক গোছা ফুলের দিকে তাকিয়ে বলল, ওগুলো কী? পিংক রজনীগন্ধা মনে হচ্ছে।

দোকানদার বলল, না, ওগুলো অন্য ফুল!

জোজো বলল, আলবাৎ পিংক রজনীগন্ধা! আমি ফুল চিনি না? জানিস সন্তু, এগুলো খেতে দারুণ লাগে। পিন হেড মাশরুম যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এতেই চলবে। আমাদের ওই প্রেসিডেন্ট এই পিংক রজনীগন্ধা খেতেও খুব ভালবাসেন। এতেও আমার কাজ হয়ে যাবে।

জোজো হাত বাড়িয়ে সেই ফুলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে কচ কচ করে চিবিয়ে বলল, বাঃ, খুব টাটকা। স্বাদও ভাল। সন্তু, একটু খেয়ে দেখবি নাকি?

সন্তু বলল, না, না।

জোজো দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, এই এক ডজন ফুল কত দাম?

দোকানদার বলল, ও ফুল বিক্‌কিরি হবে না!

জোজো বলল, কেন?

দোকানদার বলল, যারা ফুল খায়, তাদের আমরা ফুল বিক্‌কিরি করি না!

জোজো বলল, ইল্লি আর কী! আমি দাম দিলে আপনি বিক্রি করবেন না কেন? কেনার পর আমি সে ফুল দিয়ে পুজো করি কিংবা খেয়ে ফেলি, তাতে আপনার কী?

দোকানের অন্য একজন লোক বলল, সকালবেলা প্রথম খদ্দের ফেরাতে নেই। তাতে অকল্যাণ হয়। ঠিক আছে, এক ডজন ফুল নিয়ে যান, দশ টাকা দিন।

জোজো বলল, অত দাম? মোটেই না। পাঁচ টাকা দিতে পারি।

লোকটি বলল, এ ফুল অত শস্তা নয়। প্রথম খদ্দের, তাই শস্তায় দিচ্ছি। আট টাকা লাগবে। তার কমে হবে না।

জোজো বলল, তা হলে আমি চার টাকা দেব।

অ্যাঁ! এই যে বললেন পাঁচ টাকা দেবেন?

দোকানদার যা দাম বলবে, তার আদ্ধেক দেব, এই আমার নিয়ম!

প্রথমে পাঁচ টাকা বলেছিলেন, পাঁচ টাকাই দিন অন্তত।

তা হলে আমি আড়াই টাকা দেব।

ওরে বাবা, প্রথম খদ্দের নিয়ে এত ঝামেলা...আপনাকে..আপনাকে আমি বিনা পয়সায় দিচ্ছি, যান, নিয়ে যান।

বিনা পয়সায় দিলে আমাকে দু ডজন দিতে হবে!

ওরে বাবারে, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি, দিনটা কী সাঙ্ঘাতিক যাবে, সকালবেলাতেই এত লোকসান, হায় রাম, হায় রাম, প্রথম খদ্দের, যান, দু ডজনই নিয়ে যান, কিছু দিতে হবে না। আর কিছু চাইবেন না তো?

সন্তু জোজোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

জোজো এবার একগাল হেসে ফেলে বলল, আমার বন্ধু রাগ করছে। আমি বিনা পয়সায় কারও কাছ থেকে কিছু নিই না। মরদ কা বাত, হাতি না দাঁত! প্রথমে পাঁচ টাকা বলেছি, দিচ্ছি পাঁচ টাকা, এক ডজন দিন!

ফুল হাতে নিয়ে সে-দোকান থেকে খানিকটা দূরে সরে এসে জোজো বলল, মাশরুমের বদলে বেশ ভাল জিনিসই পাওয়া গেল। পিংক রজনীগন্ধা। স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। এই ফুলের একটা আমি খাব, একটা বাবা খাবেন। আর বাকি দশটা প্রেসিডেন্ট সাহেব খেয়ে ফেলবেন ডাঁটা সুষ্ঠু। কী তাড়াতাড়ি যে উনি খেয়ে ফেলবেন, তুই কল্পনাই করতে পারবি না, সন্তু।

সন্তু বলল, জোজো, আমি তোর বাড়িতে এখন যাব? এত ফুল একজন মানুষ কী করে খেতে পারে, একবার দেখব!

জোজো চোখ কপালে তুলে বলল, ভেরি সরি, এখন কাউকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বারণ। প্রেসিডেন্ট সায়ে যে আমাদের ওখানে আছেন, সেটা টপ সিক্রেট। তুই যেন মুখ ফসকে কাউকে বলে ফেলিস না!

২. জোজোর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না

জোজোর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না কখনও। কতটুকু যে সত্যি আর কতটা গুল, সেটাই ধরা মুশকিল।

দুদিন বাদে কাগজে একটা খবর বেরোল। আফ্রিকার একটি রাজ্যের প্রেসিডেন্টের ভাই কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল থেকে উধাও হয়ে গেছেন। তিনি দার্জিলিং যাওয়ার পথে কলকাতায় ছিলেন। হোটেলের ঘরে তাঁর সব জিনিসপত্র পড়ে আছে। কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে দুজন সেক্রেটারি এসেছে, তারা কিছুই বলতে পারছে না।

তা হলে আফ্রিকার কোনও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট না থোক, প্রেসিডেন্টের ভাই একজন এসেছিলেন ঠিকই। জোজো কোনওক্রমে সেটা জানতে পেরেছিল। হয়তো সেই প্রেসিডেন্টের ভাই জোজোর বাবার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু জোজোদের বাড়িতে তো তিনি ছিলেন না, ছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। কাগজে লিখেছে, প্রেসিডেন্টের ভাই সাইমন বুবুম্বা খুব পণ্ডিত লোক, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন, তিনি কি কাঁচা কাঁচা রজনীগন্ধা চিবিয়ে খান?

কলেজের গেটের কাছে জোজোর সঙ্গে দেখা হতেই সে ফিসফিস করে বলল, তোকে বলেছিলুম না, আমার পেছনে স্পাই ঘুরছে? দেখলি তো, প্রেসিডেন্টকে গুম করে দিল?

সন্তু বলল, উনি তো প্রেসিডেন্ট নন, প্রেসিডেন্টের ভাই!

জোজো বলল, পরের বছর উনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে।

সন্তু বলল, উনি কি তোদের বাড়িতে থাকতেন? কাগজে যে লিখেছে, গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছিলেন। হোটেলে থাকলে তো সবাই জানতে পারে।

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, কাগজে অনেক ভুল লেখে। কাকাবাবুকে তুই একটু বল না। উনি চেষ্টা করলে হয়তো বুবুম্বাকে খুঁজে বার করতে পারবেন।

কাকাবাবু এখন খুব ব্যস্ত। কী নিয়ে যেন খুব পড়াশোনা করছেন সারাদিন। তোর বাবা তো জ্যোতিষী। তিনি গুনেটুনে বলে দিতে পারেন না, ওঁকে কোথায় ধরে রাখা হয়েছে?

বাবা তো এখানে নেই। কাল রাত্তিরের প্লেনেই চলে গেলেন আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট বুশ ডেকে পাঠিয়েছেন। খুব আর্জেন্ট!

কেন, প্রেসিডেন্ট বুশ তোর বাবাকে ডেকে পাঠালেন কেন?

খুব গোপন ব্যাপার! আমেরিকায় এ বছর ইলেকশান হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ভয় পেয়ে গেছেন, দ্বিতীয়বার জিততে পারবেন না। সেইজন্য বাবাকে দিয়ে একটা মাদুলি তৈরি করতে চান। অষ্টবর্জ মাদুলি! সেই মাদুলি ধারণ করলে যে-কোনও ইলেকশান একেবারে ফুঃ! তুড়ি মেরে বেরিয়ে যাবে!

আমাদের দেশের নেতারা ভোটের সময় তোর বাবার কাছ থেকে ওই মাদুলি ধারণ করতে যায় কেউ?

ওই মাদুলির কত খরচ জানিস? নিরানব্বই লাখ টাকা। দশ দিন যজ্ঞ করতে হবে, তিন কেজি প্ল্যাটিনাম লাগবে... অত টাকা দেওয়ার হিম্মত আর কার আছে?

আচ্ছা, জোজো, তুই তোর বাবার কাছ থেকে জ্যোতিষ বিদ্যেটা শিখে নিস কেন? তা হলে আর তোকে চাকরি করতে হবে না।

সব শেখা হয়ে গেছে। গুলে খেয়েছি। তুই কী জানতে চাস বল না! তোর পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব বলে দিতে পারি।

মাফ করো ভাই, জোজো। আমি জ্যোতিষে—হাত দেখা-টেখায় বিশ্বাস করি না। আমাদের বাড়িতে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এই সময় ওদের ক্লাসের আরও তিন চারটি ছেলে এসে পড়ায় এ-কথা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা ঢুকে গেল ক্লাসে।

কলেজে সন্তু চুপচাপ থাকে। তার বয়েসী ছাত্রদের তুলনায় সন্তু বেশ বিখ্যাত। সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে গেছে, খবরের কাগজে সেসব বেরিয়েছে। কিন্তু সন্তু সেসব নিয়ে কলেজে কোনও আলোচনা করতে চায় না। অবশ্য তার ভালনাম সুনন্দ, সেই নামেই সমস্ত ছেলেরা তাকে চেনে, তার ডাকনামটা জানে না অনেকেই।

জোজো সব সময় জমিয়ে রাখে। তার গল্পের শেষ নেই। কামস্কাটকা, পাপুয়া নিউগিনি, আদ্দিস আবাবা এই সব কত জায়গা সে ঘুরে এসেছে বাবার সঙ্গে। একবার প্লেন ক্র্যাশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগরে, সেখান থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে। আর একবার উগান্ডার জঙ্গলে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল সিংহর কবলে, শুধু টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে সিংহ দুটোর চোখ ধাঁধিয়ে কাবু করে দেয়।

ক্লাস চলছে। সবাই মন দিয়ে শুনছে স্যারের লেকচার। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ডেস্কের ওপর। জোজো খাতা খুলে হিজিবিজি ছবি আঁকছিল, হঠাৎ এক সময় এক টুকরো পাথর পকেট থেকে বার করে রাখল টেবিলের ওপর। দেখলে মনে হয় সাধারণ একটা কালচে রঙের পাথরের টুকরো।

জোজোর একপাশে বসেছে সন্তু, অন্যপাশে অভিজিৎ। সন্তু কোনও কৌতূহল দেখাল না, সে লেকচার শুনে শুনে নোট নিচ্ছে। অভিজিৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী রে?

জোজো বলল, দেখতেই তো পাচ্ছিস, একটা পাথব।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, পাথর তো বুঝলাম, এটা তুই পকেটে রাখিস কেন?

জোজো বলল, এটা আমি সব সময় পকেটে রাখি। এর কত দাম, তা শুনলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি। তবে, মাঝে মাঝে পকেট থেকে বার করে রোদ খাওয়াতে হয়।

পাথরকে রোদ খাওয়াতে হয়?

হ্যাঁ। নইলে এ পাথর নরম তুলতুলে হয়ে যাবে!

অভিজিৎ হি-হি করে জোরে হেসে উঠল।

প্রোফেসর পড়া থামিয়ে এদিকে তাকালেন। প্রোফেসর জি সি বি গম্ভীর ধরনের মানুষ, কখনও হাসেন না, সবাই তাঁকে সমীহ করে। জোজো আর অভিজিৎ মাথা নিচু করে লেখায় মন দিল।

একটু পরে জোজো আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, এই অভিজিৎ, বোকার মতন হাসলি কেন রে?

অভিজিৎ বলল, পাথর নরম হয়ে যায়, তাই শুনে হাসি পেয়ে গেল!

জোজো অবজ্ঞার সুরে বলল, নরম পাথর বুঝি হয় না? জানিস না কিচ্ছু! এই পাথরটা...এই পাথরটা চাঁদ থেকে আনা হয়েছে। এটা একটা চাঁদের টুকরো। সারাদিন রোদ্দুর খেলে রাত্তিরবেলা চকচক করে।

অভিজিৎ বলল, এটা চাঁদের পাথর?

জোজো বলল, না হলে কি এমনই পকেটে নিয়ে ঘুরছি?

অভিজিৎ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সার, সার, রজত একটা চাঁদের পাথর নিয়ে এসেছে!

সারা ক্লাসে অমনই হইচই পড়ে গেল।

জি সি বি পড়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন।

অভিজিৎ পাথরটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, দিস ইজ আ মুন স্টোন সার!

জোজো তার ইংরিজি শুদ্ধ করে দিয়ে বলল, মুন স্টোন নয়, সে তো অন্য জিনিস, লোকে আংটিতে পরে। দিস ইজ আ পিস অফ স্টোন ফ্রম দা মুন।

সন্তু আগাগোড়া চুপ করে আছে, একটাও কথা বলেনি। মিটিমিটি হাসছে। শুধু। জোজোর কাণ্ডকারখানা দেখে সে আর অবাক হয় না।

জি সি বি এগিয়ে এসে পাথরটা নিজের হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, এটা সত্যিই চাঁদের টুকরো? তুমি এটা পেলে কী করে?

জোজো বলল, আমাকে নীল আর্মস্ট্রং দিয়েছেন। প্রথম মানুষ যিনি চাঁদে পা দিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মস্ট্রং। উনি পকেটে ভরে অনেক টুকরো নিয়ে এসেছিলেন তো?

অধ্যাপক একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়ে বললেন, নীল আর্মস্ট্রং! তিনি তোমাকে দিলেন, মানে, তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হল?

জোজো বলল, কলকাতায়। উনি তো এখানে অনেকবার এসেছেন। আমায় খুব ভালবাসেন। নীল সাহেব আমার ছোট কাকার সঙ্গে হাভার্ডে পড়েছেন যে এক ক্লাসে। দুজনে পাশাপাশি বসতেন। আমাদের বাড়িতে এসে উনি ডাল-ভাত খান। ঝিঙে-পোস্ত ওঁর খুব পছন্দ!

ক্লাসের অনেক ছেলে হাসতে শুরু করেছে। কিন্তু জি সি বি মুখ্যভাবে পাথরটা দেখতে লাগলেন। আপন মনে বললেন, এ ঘটনা তো কাগজে বেরনো উচিত। চাঁদের পাথর, দারুণ দামি জিনিস। হাতে ধরাটাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা রজত, নীল আর্মস্ট্রং তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেননি তো? একটা যে-কোনও পাথর দিয়েই যদি বলা যায় চাঁদের পাথর..

জোজো বলল, সার, আমার ছোটকাকা একজন সায়েন্টিস্ট। মাইক্রো কারবন টেস্ট করে দেখে নিয়েছেন।

জি সি বি আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, ফ্যান্টাস্টিক!

এই সময় ঘন্টা পড়ে গেল। ক্লাস শেষ। জোজো সারের হাত থেকে পাথরটা নিয়ে অবহেলার সঙ্গে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর বীরদর্পে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, বাড়ি যাই। আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে অমিতাভ বচ্চন আসবে চা খেতে। বেচারিকে ছদ্মবেশে আসতে হয়, নইলে বাড়ির সামনে বড্ড ভিড় হয়ে যায়।

কলেজের বাইরে এসে সন্তু আর জোজোকে খুঁজে পেল না। সে আগেই কোনও বাসে উঠে পড়েছে।

জোজোর স্বভাব জানে সন্তু। কাল যদি জোজোকে ওই চাঁদের পাথরটার কথা জিজ্ঞেস করা হয়, ও হেসে উড়িয়ে দেবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলবে, সেটা রেখে দিয়েছি ছাদের এক কোনায়। আজ একটা অন্য জিনিস দেখবি?

তারপরই জোজো আর-একখানা চমক দেবে।

বাড়ি ফিরে সন্তু জলখাবার খেয়ে নিল। তারপর জামা-প্যান্ট বদলে গেল সাঁতারের ক্লাবে। গরমকালে প্রত্যেকদিন সন্তুর সাঁতার কাটা অভ্যেস। সকালবেলা সময় পায় না, তাই বিকেলের দিকে যায়।

সাঁতারের ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না সন্তু। সামনের রাস্তায় দারুণ ভিড়। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে একখানা গাড়ি ঘিরে চ্যাঁচামেচি করছে। এক গাড়ি পুলিশও এসে গেল। কী ব্যাপার, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

অন্যদের কথাবার্তা শুমে সন্তু বুঝল, সেরকম, কিছু নয়। বিখ্যাত সিনেমাস্টার অমিতাভ বচ্চন এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, কিছু লোক তাঁকে চিনে ফেলেছে। সবাই চায় ওঁর অটোগ্রাফ নিতে, কেউ-কেউ ওঁর গলায় শোলে ফিল্মের দু চারটে ডায়ালগ শুনতে চায়।

সন্তু মনে-মনে হাসল।

জোজো অনেক রকম খবর রাখে। কোথা থেকে জেনেছে যে অমিতাভ বচ্চন এখন কলকাতায়। তা হলে জোজোদের বাড়িতে ওঁর চা খেতে যাওয়াটা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা যায় না।

অমিতাভ বচ্চন ছদ্মবেশ ধরতে ভুলে গেলেন কেন?

এতসব ঝঞ্ঝাট দেখে সাঁতার না কেটেই ফিরে এল সন্তু।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়েই সন্তুর চক্ষু স্থির। প্রথম পাতাতেই বড় বক্স করে ছাপা হয়েছে, চাঁদের পাথর চুরি!

কলকাতার মিউজিয়ামে এক টুকরো চাঁদের পাথর রাখা ছিল, সেটা গতকাল চুরি হয়ে গেছে। এই পাথরটা মার্কিন সরকার দিয়েছিল। এ-পর্যন্ত আমেরিকানরাই শুধু চাঁদে নেমেছে। তারা যে পাথর কুড়িয়ে এনেছে, তার কিছু-কিছু দেওয়া হয়েছে অন্য কয়েকটা দেশকে। আমাদের দেশ পেয়েছে পাঁচটা টুকরো। সেগুলো দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতার মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। একমাস বাদে আবার পাথরগুলো আমেরিকায় ফেরত চলে যাবে। তার মধ্যে কলকাতারটা চুরি হয়ে গেছে খুবই

রহস্যময়ভাবে। রাখা হয়েছিল খুবই সাবধানে। বুলেট প্রুফ কাচের বাক্স, সবাই দূর থেকে দেখবে। কেউ কাচের বাক্সটার গায়ে হাত দিলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। রাত্তিরে মিউজিয়াম ভালভাবে পাহারা দেওয়া হয়। কেউ কিছু টের পায়নি, কিন্তু গতকাল সকালে দেখা গেছে সেই কাচের বাক্সটা খোলা। পাথরটা উধাও হয়ে গেছে!

সন্তুর বুকের ভেতরটা ধক ধক করতে লাগল। জোজোটা কোনও পাগলামি করেনি তো? এটা যদি জোজোর কীর্তি হয়, তা হলে ওকে খুব সহজেই পুলিশে ধরে ফেলবে। কাল কলেজে ক্লাসসুষ্টু ছেলেমেয়েরা জোজোর কাছে চাঁদের পাথর দেখেছে। অধ্যাপক জি সি বি দেখেছেন। কেউ না কেউ পুলিশকে বলে দেবেই।

চাঁদের পাথর অতি দুর্লভ জিনিস। নীল আর্মস্ট্রং পকেট থেকে লজেন্স বার করার মতন একটা ওই পাথর জোজোকে দিয়ে যাবেন, এ কি হতে পারে? সব কটা টুকরোই মার্কিন গভর্নমেন্টের সম্পত্তি!

চুরির কথা জানা গেছে কাল সকালে। আর দুপুরবেলাতেই জোজো একটা পাথর দেখিয়েছে। এটা কি কাকতালীয়? না কি, জোজো বারফট্টাই দেখাতে গিয়ে সত্যিই এরকম কাণ্ড করেছে!

ছি ছি, পুলিশ যদি এখন জোজোকে ধরে তা হলে কী হবে? জোজো কতটা সত্যি বলে আর কতটা বানায়, তা যে ধরাই যায় না। ওটা সত্যি যদি চাঁদের পাথর হয়, তা হলে জোজোর ওপর সন্দেহ তো পড়বেই!

খবরের কাগজখানা হাতে করে সন্তু কাকাবাবুর ঘরে চলে এল।

কাকাবাবু একটা পাতলা সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে ইজি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। সামনে একটা ছোট্ট টুলের ওপর পা-দুখানা তোলা।

সন্তু পাশে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এই খবরটা পড়েছ?

কাকাবাবু এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তোর এব্যাপারে এত আগ্রহ হল কেন? তুই ডিটেকটিভ হতে চাস নাকি?

সন্তু বলল, না, তা নয়, তবে আমি ভাবছি, হঠাৎ কেউ এই পাথরটা চুরি করতে গেল কেন?

কাকাবাবু বললেন, যেসব জিনিস খুব সাবধানে, পাহারা দিয়ে রাখা হয়, সেসব জিনিসের ওপরেই চোরেদের লোভ বেশি হয়। কেউ-কেউ বেশি দুঃসাহস দেখাবার জন্য সেগুলো চুরি করতে যায়।

চাঁদের পাথরের দামও নিশ্চয়ই অনেক?

তা তো হবেই। যে-জিনিস কম পাওয়া যায়, তারই দাম বেশি হয়। ইস্পাত কিংবা লোহার তুলনায় সোনা অনেক কম আছে, সোনা সেইজন্য। দামি। পৃথিবীতে হিরে-চুনি-পান্নার মতন মূল্যবান পাথরের তুলনাতেও চাঁদের পাথর আর কতটা? চাঁদের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য বেশি বড় বড় পাথর ভেঙে আনা হয়নি! কয়েকটা বড় বড় পাথর সরে গেলে চাঁদটা যদি আঁকাবাঁকা ভাবে ঘুরতে শুরু করে তা হলে কী হবে বল তো?

তা হলে পৃথিবীতে সমুদ্র, নদীগুলোতে জোয়ার-ভাটা সব উলটোপালটা হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছিস। ভাব দেখি, চাঁদটা পৃথিবীর একটু কাছে চলে এল, অমনই সমুদ্রের জল লাফিয়ে উঠতে শুরু করল! জলস্তম্ভ হয়ে কত দেশ ভেসে যাবে। সেইজন্যই চাঁদের অভিযাত্রীরা খুব হিসেব করে ছোট-ছোট কিছু টুকরো নিয়ে এসেছে। এগুলো একেবারে অমূল্য। বৈজ্ঞানিকদের কাছে চাঁদকে ভাল করে জানার অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। আবার এক হিসেবে এই পাথরগুলোর কোনও দামই নেই।

কেন?

কেউ এই পাথর তো অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবে না! এ-পর্যন্ত চাঁদ থেকে যত পাথর আনা হয়েছে, সবই সরকারি সম্পত্তি। কেউ নিজের কাছে রাখতে পারবে না। বিক্রি করা না গেলে আর দাম কিসের?

সন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল। তার মনের মধ্যে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। জোজো মিথ্যে কথা বলেছে, না সত্যি কথা বলেছে? যদি পুরোটাই মিথ্যে কথা বলে থাকে, তা হলেও বোধ হয় পুলিশ ওকে ছাড়বে না!

আমতা-আমতা করে সন্তু বলল, কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কাকাবাবু খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, কী রে, তোর কী হয়েছে? কী জিজ্ঞেস করবি? তার জন্য ঘাড় চুলকোচ্ছিস কেন?

সন্তু বলল, আমার বন্ধু জোজোকে তো তুমি চেনো?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, চিনব না কেন? সেই যে আমাদের সঙ্গে একবার মধ্যপ্রদেশে গেল, যেবারে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে আমরা একটা অপূর্ব সুন্দর নীল মূর্তি উদ্ধার করলাম!

জোজো কাল আমাদের একটা চাঁদের পাথর দেখিয়েছে!

তাই নাকি? কী করে বুঝলি সেটা চাঁদের পাথর?

জোজো বলল, ওটা নীল আর্মস্ট্রং নিজে ওকে দিয়েছেন।

কাকাবাবু হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠলেন। দু-তিনবার নীল আর্মস্ট্রং-এর নাম উচ্চারণ করে বললেন, নীল আর্মস্ট্রং যাকে তাকে চাঁদের পাথর বিলি করে বেড়ায়, এমন তো শুনিনি! আমি সেবারেই লক্ষ করেছি, তোর ওই বন্ধুটির কল্পনাশক্তি খুব প্রবল!

জোজো তা হলে মিথ্যে কথা বলেছে?

উচ্চ কল্পনাশক্তি আর মিথ্যে কথা ঠিক এক নয়। মিথ্যে অনেক রকম। পয়লা এপ্রিল কেউ যদি এপ্রিল ফুল করার জন্য কিছু বলে, তাকে ঠিক মিথ্যে বলা যায় না। অনেকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে। যাকে আমরা বলতুম গুল মারা। তোরাও কি তাই বলিস?

হ্যাঁ।

গুলবাজরা খুব মজার নোক হয়, সাধারণ মিথ্যুকদের সঙ্গে তাদের তফাত আছে।

মিউজিয়াম থেকে কাল সকালে চাঁদের পাথরটা চুরি গেছে। আর দুপুরবেলা জোজো আমাদের চাঁদের পাথর বলে একটা পাথর দেখাল। এটা জানতে পারলে পুলিশ ওকে সন্দেহ করবে না?

তা করতে পারে অবশ্য। পুলিশ তো আর আসল চোরকে সহজে ধরতে পারবে না, ওকে নিয়েই টানাটানি করবে।

জোজোর বাবা এখন ইণ্ডিয়াতে নেই। পুলিশ যদি জোজোকে জেলে ভরে দেয়–

তুই এক কাজ কর, সন্তু। জোজোকে গিয়ে বল, ওটা নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে আসতে। আমি পাথরটা একবার দেখতে চাই।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে কাকাবাবু বাথরুমে চলে গেলেন।

এই ঘরেই টেলিফোন। সন্তু চট করে জোজোদের বাড়ির নম্বর ঘোরাল। জোজোই ওদিক থেকে প্রথম হ্যালো বলল।

সন্তু উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, এই জোজো, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস?

জোজো বলল, না। কেন? সক্কালবেলাতেই ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ বাবাকে ফোন করেছিলেন একটা ব্যাপার জানতে। বাবা তো কলকাতায় নেই। কুইন তখন আমায়

বললেন, মাস্টার জোজো, তুমি তো তোমার বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছ। তুমি এটা বলতে পারবে না? আমি যত বলি, ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমি অতটা শিখিনি, তবু তিনি বলতে লাগলেন, তুমি একবার পুজোয় বসে চেষ্টা করে দ্যাখো না!

ইংল্যান্ডের রানি তোর কাছে কী জানতে চাইলেন? সেটা টপ সিক্রেট। তোকে বলা যাবে না। এই সন্তু; টেলিফোনটা বেশিক্ষণ আটকে রাখিস না। একটু বাদেই নরওয়ের রাজার ফোন করার কথা আছে। ওঁর জিনিসটা অবশ্য আমি রেডি করে রেখেছি।

ওসব রাজারানির কথা ছাড় তো, জোজো। আজকের কাগজ পড়ে দ্যাখ। সব কাগজেই ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে।

কী বেরিয়েছে তাই বল না! এখানে কাগজ নেই হাতের কাছে।

কলকাতার মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথর কাল সকালে চুরি গেছে।

জোজো একটুক্ষণ থমকে গেল যেন। তারপর নীরস গলায় বলল, ও, চুরি গেছে। সেই খবরের জন্য তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমিই বা কী করব?

তুই কাল যেটা দেখালি, সেটা সত্যিই চাঁদের পাথর?

রজত ভট্টাচারিয়া কখনও এলেবেলে কথা বলে না।

যদি এলেবেলে কথা না হয়, তা হলে, তা হলে, ওই পাথর কলকাতা শহরে, শুধু কলকাতা কেন ইণ্ডিয়াতেই আর কারও কাছে নেই। এর মানে বুঝতে পারছিস না?

না। পারছি না।

পুলিশ তোকে সন্দেহ করবেই।

সন্দেহ করলেই হল? কোথাকার কী চুরি গেছে, তার জন্য আমি দায়ী হব কেন?

তোকে যে ওই পাথরটা নীল আর্মস্ট্রং দিয়েছেন তার কোনও প্রমাণ আছে?

প্রমাণ, মানে, প্রমাণ আবার কী? কেউ যদি কাউকে কোনও জিনিস দেয়, তার সঙ্গে কি কোনও প্রমাণের সার্টিফিকেট লিখে দেয়? তুই যে সেবারে ইজিপ্টে গেলি, সেখান থেকে আমাকে একটা পিরামিডের পাথরের মূর্তি এনে দিলি, সেটার কি কোনও প্রমাণ রাখতে হয়েছে?

সেটা তো একটা সাধারণ জিনিস। তার সঙ্গে কি এটার তুলনা হয়? তুই এক কাজ কর জোজো, পাথরটা নিয়ে চট করে আমাদের এখানে চলে আয়। কাকাবাবু পাথরটা দেখতে চেয়েছেন।

বিকেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। এখন তো পারব না। নরওয়ের রাজার জরুরি কাজ আছে।

দূর ছাই তোর নরওয়ে-ফরওয়ে! শোন জোজো, তোর কাছে যে-কোনও সময় পুলিশ যেতে পারে। কাকাবাবু তোকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। কাকাবাবুর কাছে থাকলে তুই বেঁচে যাবি। এখন তোর যা ইচ্ছে কর!

রাগ করে সন্তু টেলিফোনটা রেখে দিল।

একতলা থেকে মা চা-জলখাবারের জন্য ডাকছেন, তাই নেমে যেতে হল একতলায়। মনে-মনে সে গুমরোচ্ছে। জোজোটা এক-এক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়! সন্তু যেন কল্পনায় দেখতে পেল পুলিশ জোজোদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তারপর হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে জোজোকে। তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে ওর আঙুলের ডগায় আলপিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে তিন-চারজন পুলিশ অফিসার জেরা করছে, বল, ছোকরা, তুই এই চাঁদের পাথর কোথায় পেয়েছিস? পরশু রাতে মিউজিয়ামের কাছে কেন গিয়েছিলি?

ঠিক সতেরো মিনিটের মধ্যে সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে জোজো এসে উপস্থিত হল। সাদা প্যান্ট আর নীল রঙের একটা গেঞ্জি পরা। চেহারা দেখলে মনে হয়, কী সরল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না!

ভেতরে ঢুকেই সন্তুর মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, মাসিমা, এই সাতসকালে কেন ছুটে এলুম জানেন? অন্য একটা কাজে সন্তু টেলিফোন করেছিল, সেই টেলিফোনেই গন্ধ পেলুম এখানে আজ লুচি ভাজা হচ্ছে। সেইসঙ্গে আলুর দম! আমি লুচি-আলুর দম যা ভালবাসি!

মা অবাক হয়ে বললেন, শোনো কথা! টেলিফোনে বুঝি গন্ধ পাওয়া যায়? তাও টেলিফোনটা দোতলায় আর রান্নাঘর একতলায়।

সন্তু অস্থিরভাবে বলল, ওঃ, মা! একতলা-দোতলায় কিছু আসে-যায় না। টেলিফোনে গন্ধ পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জোজোটা আন্দাজে ঢিল মেরেছে।

জোজো বলল, অন্য কেউ না পেলেও রজত ভট্টাচারিয়া টেলিফোনেও গন্ধ পায়। একবার আফ্রিকা থেকে একজন ফোন করেছিল।

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, তুই সেই ফোনেই সিংহের গন্ধ পেয়েছিলি? আমাদের বাড়িতে সব ছুটির দিনই লুচি হয়। একদম বাঁধা। একঘেয়ে। তুই আগেও এসে খেয়েছিস!

জোজো অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল, প্রত্যেক ছুটির দিন আলুর দম হয়?

মা বললেন, এটা ও বলল কী করে?

এইটাই জোজোর জয়। ও আন্দাজে ঢিল মারলেও খানিকটা মিলিয়ে দেয়। সন্তুদের বাড়িতে লুচির সঙ্গে থাকে সাধারণত বেগুন ভাজা কিংবা ডিমের তরকারি। আজই স্পেশাল আলুর দম হয়েছে। জোজো বোধ হয় ভেতরে এসেই গন্ধ পেয়েছে।

৩. চাঁদের কণা

কাকাবাবু পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, হুঁ, এটাকে দেখতে তো একেবারে একটা সাধারণ পাথরের মতন। একটু কালচে-কালচে ধরনের। পূর্ণিমার রাত্তিরে আকাশের চাঁদ চকচক করে। দেখলে মনে হয়, ওর একটা টুকরোও অমন চকচকে হবে। সুন্দর-সুন্দর খোকা-খুকুদের মায়েরা আদর করে বলত, চাঁদের কণা!

সন্তু বলল, চাঁদের ওপর সূর্যের আলো পড়ে বলেই ওরকম চকচক করে।

কাকাবাবু বললেন, সে তো আজকাল ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। কিন্তু আকাশের দিকে তাকালে কি আর সে কথা মনে থাকে? চাঁদ নিয়ে এখনও কত কবিতা লেখা হয়। গান হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো..। আসলে কিন্তু চাঁদের কোনও হাসিও নেই, নিজস্ব আলোও নেই। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই চাঁদের পাথরে নতুন কোনও ধাতু কিংবা খনিজ পদার্থও নেই। চাঁদ তো আসলে পৃথিবীরই একটা টুকরো। এক সময় পৃথিবী থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সন্তু বিজ্ঞের মতন বলল, এ-বিষয়ে অনেক থিয়োরি আছে।

কাকাবাবু বললেন, ওসব থিয়োরির কথা থাক। আচ্ছা জোজো, নীল আর্মস্ট্রং এই পাথরটা তোমায় কবে দিলেন?

জোজো বলল, এই তো গত মাসে। একুশে এপ্রিল।

কাকাবাবু বললেন, একুশে এপ্রিল? পয়লা এপ্রিল নয়?

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? এটা দেখতে সাধারণ পাথরের মতন হলেও মোটেও সাধারণ নয়। এটাকে সারাদিন রোদ খাওয়ালে রাত্তিরবেলা এর থেকে আলো ফুটে বেরোয়। ঠিক জ্যোৎস্নার মতন।

কাকাবাবু বললেন, বটে, বটে? তা হলে তো রাত্তিরবেলা দেখতে হচ্ছে।

এই সময় সিঁড়িতে বেশ ভারী পায়ের শব্দ হল। রঘু একজন বেশ বড়সড় চেহারার মানুষকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সন্তু এঁকে চেনে। ইনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা নাসির হোসেন। খুব গান ভালবাসেন। এক-একদিন সন্ধেবেলা কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসেন ইনি, অনেক গান গেয়ে শোনান, তখন ওঁকে দেখে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে মনেই হয় না।

কাকাবাবু বললেন, এসো নাসির, এসো! চা-টা খেয়ে এসেছ, না খাবে?

নাসির হোসেন বললেন, নাস্তা করে এসেছি। কী ব্যাপার, রাজাদা, আজ এত সকাল-সকাল তলব; আপনার বাড়িতে কিছু চুরিটুরি হয়েছে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, না, না, সেসব কিছু না। তুমি নিশ্চয়ই আজ সকাল থেকেই ব্যস্ত?

নাসির হোসেন বললেন, আর বলেন কেন! কাল থেকেই কপালের ঘাম ছুটে যাচ্ছে। মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথরটা চুরি হয়েছে জানেন তো? ওই পাথরটা আবার আমাদের সম্পত্তি নয়। আমেরিকান গভর্নমেন্ট এক মাসের জন্য ধার দিয়েছে, সাধারণ মানুষদের দেখবার জন্য। আবার ফেরত দিতে হবে। এর মধ্যে চুরি। উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের মান-সম্মান সব যাবে।

কাকাবাবু বললেন, ওটা চোরেরা কেন নেবে? কী লাভ?

নাসির হোসেন বললেন, সেই তো! কোনও এক স্টুপিড চোরের কাণ্ড। সে ব্যাটা ওটাকে কোথাও বিক্রিও করতে পারবে না!

কাকাবাবু বললেন, তুমি তো সন্তুকে চেনো। আর এই ছেলেটি সন্তুর বন্ধু, ওর ডাকনাম জোজো, সবাই সেই নামেই চেনে, তবে কলেজের খাতায় ওর নাম রজত ভট্টাচার্য।

নাসির হোসেন যেন হঠাৎ ভূত দেখলেন। চোখ বড় বড় করে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, জোজো! রজত ভট্টাচার্য! প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র?

জোজো দুদিকে মাথা নাড়ল।

নাসির হোসেন মাথায় হাত দিয়ে বললেন, মাই গড! আমার ডিপার্টমেন্টের অন্তত দশজন অফিসার এর মধ্যে সারা শহরে এই ছেলেটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, জানেন রাজাদা, আজকের কাগজে খবরটা ছাপা হওয়ার পর অন্তত সাতজন আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানিয়েছে যে তারা জোজো ওরফে রজত ভট্টাচার্যের কাছে একটা চাঁদের পাথর দেখেছে। এখন চাঁদের পাথর তো আর রাস্তা-ঘাটে ছড়াছড়ি যায় না। কী করে ওই ছেলেটি পেল! কিন্তু যারা খবর দিয়েছে, তারা কেউ ছেলেটির ঠিকানা বলতে পারেনি। আজ কলেজ বন্ধ। আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি, যে করে হোক আজই প্রেসিডেন্সি কলেজের অফিস খুলিয়ে, খাতাপত্র দেখে ছেলেটির ঠিকানা বার করতেই হবে।

কাকাবাবু চওড়াভাবে হেসে বললেন, তোমার অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে দিলাম। তোমাকেও টেলিফোনে ডাকলাম। জোজোকেও এখানে আনিয়ে রেখেছি। এবার তোমরা কথাবার্তা বলে নাও!

জোজো কটমট করে তাকাল সন্তুর দিকে। সন্তু নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, কাকাবাবু জোজোকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য নাসির হোসেন সাহেবকে আসতে বলেছেন।

কাকাবাবু কোলের ওপর পাথরটা রেখেছিলেন। তুলে ধরে বললেন, এটাই। কি চাঁদের পাথর নাকি?

হঠাৎ খুশিতে ঝলমলে হয়ে গেল নাসির হোসেনের ফরসা মুখখানা।

তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, দিস ইজ ইট! দিস ইজ ইট! এই তো সেই পাথর। জিনিসটাও পাওয়া গেল! রাজাদা, আপনি কী উপকার যে করলেন! কলকাতা পুলিশের মান বাঁচালেন।

তারপর জোজোর দিকে ফিরে, মুখের চেহারা পালটে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কোথায় পেলে?

জোজো বলল, এটা আমার জিনিস?

তোমার জিনিস? এটা ছিল জাদুঘরে। কী করে তোমার হল?

জাদুঘরে অন্য একটা ছিল। এটা আমি পেয়েছি গত মাসে।

কে দিয়েছে?

আমার ছোটকাকার এক বন্ধু।

আজকাল বুঝি যে-সে চাঁদের পাথর বিলিয়ে বেড়াচ্ছে? জাদুঘর থেকে এই পাথরটা চুরি করার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আর কে-কে ছিল?

আমি চুরি করিনি। এটা আমার!

নাসির হোসেন কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, রাজাদা, আর দেরি করা যাবে না। এক্ষুনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে। দিল্লিতে রিপোর্ট করতে হবে। এই ছেলেটিকে আমি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি! চলো হে ছোকরা, ওঠো!

জোজো এতক্ষণ বেশ একটা তেজ দেখাচ্ছিল। এবার ভেঙে পড়ল।

ভাঙা-ভাঙা গলায়, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমি চুরি করিনি। কাকাবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি। আমার ছোটকাকার বন্ধু এটা ওড়িশা থেকে এনে দিয়েছেন।

নাসির হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, চোপ! ওড়িশায় চাঁদের পাথরের ছড়াছড়ি যাচ্ছে কবে থেকে?

জোজো বলল, আমার ছোটকাকার বন্ধুর নাম নীলমাধব বাহুবলীন্দ্র। সবাই তাকে নীল আর্মস্ট্রং বলে ডাকে। তিনি বলেছেন, এটা চাঁদের পাথর।

কাকাবাবু এবার হোহো করে হেসে উঠলেন, সন্তুর ঠোঁটেও আঁকা হল হাসির রেখা।

কাকাবাবু বললেন, বাহুবলী! আর্মস্ট্রং! হ্যাঁ। অনুবাদটা ঠিকই হয়েছে। আর পাথরটা যদি চন্দ্রভাগা নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা হয়, তা হলে চাঁদের পাথর বলা যেতেই পারে।

জোজো দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

নাসির হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রাজাদা, হয়তো এই ছেলেটি মিথ্যে কথাই বলেছে সবাইকে। কিন্তু এখন একে.অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। এর নাম যখন উঠেছে একবার...পাথরটাও টেস্ট করাতে হবে।

জোজো ডুকরে উঠে বলল, না, না, প্লিজ আমায় থানায় নিয়ে যাবেন না। আমার বাবা তা হলে আমাকে দারুণ বকবে। এই পাথরটায়...

নাসির হোসেন বললেন, আর কোনও কথা নয়। ওঠো, চলো! বাহুবলী!নীল আর্মস্ট্রং! দেখাচ্ছি মজা।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও নাসির। অত ব্যস্ততা কিসের! মিউজিয়ামে চাঁদের পাথরের যে টুকরোটা ছিল, তার বর্ণনা তোমার কাছে আছে নিশ্চয়ই। কতটা বড়, কতটা ওজন...

।নাসির হোসেন বললেন, হ্যাঁ, রাজাদা, সবই আছে। তার সঙ্গে এই পাথরটাও মিলে যায়। পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা পাথর, ওজন পাঁচশো সত্তর গ্রাম।

কাকাবাবু বললেন, এক মিনিট বোসো। তিনি উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন।

কাকাবাবু শখের বিজ্ঞানচর্চা করেন বলে তাঁর কাছে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি থাকে। আলমারি থেকে তিনি বার করলেন একটা ছোট্ট দাঁড়িপাল্লা। পেতলের তৈরি, গয়নার দোকানে যেরকম থাকে।

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, কখন কোন জিনিসটা কাজে লাগে, বলা কী যায়! এই ব্যালান্সটা কিনেছিলাম হংকং থেকে, খুব শস্তায় পাওয়া গিয়েছিল. .

নাসির হোসেনের হাত থেকে পাথরটা নিয়ে পাল্লার একদিকে চাপালেন, অন্যদিকে চাপাতে লাগলেন ছোট-ছোট বাটখারা। এক সময় দু দিকের পাল্লা সমান হতেই কাকাবাবু খুশিতে একটা শিস দিয়ে উঠলেন।

নাসির হোসেন এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়তেই কাকাবাবু বললেন, ভাল করে দেখে নাও। ছশো তিরিশ গ্রাম। মিউজিয়ামের পাথরটার চেয়ে এটা ভারী। এবারে তুমিই বলো, নাসির, একটা পাথরকে ভেঙে কিংবা ঘষে ঘষে ওজন কমানো যেতে পারে বটে, কিন্তু কোনওক্রমেই কি কোনও পাথরের ওজন বাড়ানো সম্ভব?

নাসিরসাহেব নিরাশভাবে একবার কাকাবাবুর দিকে, আর একার, জোজোর দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, চোর ধরা কি এত সোজা? মিউজিয়াম থেকে যারা চুরি করে তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর চোর নিশ্চয়ই। তোমাকে আরও অনেক খাটতে হবে, নাসির!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাসির হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, রাজাদা, আপনি আগে থেকেই জানতেন, তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের খানিকটা পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলাম। জোজোর ঠিকানা খুঁজে বার করা, তারপর ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করা, এতে তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হত।

নাসির হোসেন জোজোর দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে থানায় যেতে হবে, কিন্তু এই পাথরটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। পরে ফেরত পাবে?

নাসির হোসেনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সন্তু। জোজো এখনও গুম হয়ে বসে আছে।

কাকাবাবু বললেন, চিয়ার আপ, জোজো! বেশ চমৎকার একখানা প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছ! নীল আর্মস্ট্রং আর নীলমাধব বাহুবলী! এই নামে সত্যি কেউ আছে না তুমি বানিয়েছ? বানালে স্বীকার করতেই হবে যে তোমার বুদ্ধি আছে বটে!

সন্তু ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, জোজো, তুই নরওয়ের রাজার ফোন পেয়েছিলি?

জোজো এবার মুখ তুলে বলল, হ্যাঁ। ফোন করেছিলেন। কাজ হয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, নরওয়ের রাজা? তার নাম কী, নরেন্দ্র, না নরোত্তম?

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। রঘু পৌঁছে দিয়ে গেল আর একজন আগন্তুককে।

লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, নাকের নীচে তলোয়ারের মতন গোঁফ, ছাই রঙের সুট পরা, তার সঙ্গে মেরুন রঙের টাই। মাথার চুল নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো।

কাকাবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, আরে, আজ পর-পর সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে! এইমাত্র আমি নরেন্দ্র নামটা বললাম, অমনই সত্যি-সত্যি এক নরেন্দ্র এসে হাজির! এ কি ম্যাজিক নাকি?

সত্যিই এই আগন্তুকের নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে থাকেন, সি বি আই-এর এক বড় অফিসার। কাকাবাবুর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। একবার ত্রিপুরায় এঁর সঙ্গে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

নরেন্দ্র ভার্মা ঘরে ঢুকে বললেন, আমার সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল বুঝি? কী খবর, সন্টুবাবু, কেমুন আছ? মা-বাবা সবাই বহাল তবিয়তে আছেন নিশ্চয়ই?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, নরেন্দ্রকাকা, আপনি কলকাতায় কবে এলেন?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, এই তো আসছি, বম্বে থেকে মর্নিং ফ্লাইটে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোমাদের বাড়ি। রাজা, তোমার সঙ্গে আমার বহুত জরুরি দরকার আছে!

কাকাবাবু বললেন, বুঝেছি! চাঁদের পাথর চুরির খবর শুনেই তুমি ছুটে এসেছ!

নরেন্দ্র ভামা হেসে বললেন, ভুল বুঝেছ! বিলকুল ভুল। শালর্ক হোসের সঙ্গে তোমার কোনও মিল নেই!

কাকাবাবু বললেন, মিল নেই, তার কারণ আমি ডিটেকটিভ নই! জুতোর কাদা কিংবা সিগারেটের টুকরো নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তুমি তা হলে চাঁদের পাথরের জন্য আসোনি?

নরেন্দ্র ভার্মা একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, ক্যালকাটার মিউজিয়াম থেকে চাঁদের পাথর চুরি গেছে আমি জানি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু সেটা নিয়ে এখানকার পুলিশ মাথা ঘামাবে। পুলিশের কেস। আমার কোনও দায়িত্ব নেই।

কাকাবাবু বললেন, একটু আগে এলে ওই চাঁদের পাথর নিয়ে একটা মজার ব্যাপার দেখতে পেতে এখানে?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, এখুন আমার মজা-টজা দেখার সময় নেই। মাথার ওপর বিরাট দায়িত্ব, তোমার সাহায্য চাই রাজা।

কাকাবাবু বললেন, সমস্যাটা কী শুনি!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, আরে, এয়ারপোর্ট থেকে সিধা আসছি। কিছু চা-টা খাওয়াবে না? সনটু, তোমার মা নারকোলের নাড় বানাননি? ওটা আমার খুব ভাল লাগে!

সন্তু দৌড়ে নীচে গিয়ে একটা প্লেটে লুচি, আলুর দম আর কয়েকটা নারকোল-নাড় নিয়ে এসে বলল, এগুলো খান। চা আসছে।

লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই-ই বেশ উপভোগ করে খেলেন নরেন্দ্র ভার্মা। এক-একটা নারকেল নাড় আস্ত-আস্ত ছুড়ে-ছুড়ে মুখে ফেললেন। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা, তুমি বললে তোমার এখানে একটু আগে চাঁদের পাথরটা নিয়ে একটা মজা হয়েছে। তুমি কি ওই কেসটা নিয়েছ নাকি?

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, ধ্যাত! চোর ধরা কি আমার কাজ? তা হলে পুলিশ রয়েছে কেন?

তবে যে তুমি বললে?

সে অন্য মজা। পরে শুনবে। এখন তোমার সমস্যাটা বলো।

পাথরটা পাওয়া গেছে?

না।

ওটা পাওয়া না গেলে খুব মুশকিল হবে। আমেরিকার গভর্নমেন্ট সহজে ছাড়বে না।

নরেন্দ্র, তুমি কিন্তু পাথরটা নিয়েই কথা বলছ! ঠিক আছে, রাজা! আমার পয়েন্টে আসছি। পাথর চুরি গেলে আবার পাওয়া যায়, পাথর সহজে নষ্ট করা যায় না। কিন্তু আমার সমস্যা একটা মানুষকে নিয়ে। একটা মানুষ হারিয়ে গেছে।

পৃথিবীতে রোজ অনেক মানুষই তো হারাচ্ছে। নরেন্দ্র, তুমি মাথা ঘামাচ্ছ একজন বিশেষ মানুষকে নিয়ে। সাইমন বুবুম্বা।

জোজো বইয়ের র্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার

পাতা ওলটাচ্ছিল, ওই নামটা শুনে চমকে তাকাল।

সন্তুও চোখাচোখি করল জোজোর সঙ্গে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, রাজা, তুমি সাইমন বুবুম্বার কথা শুনেছ?

কাকাবাবু বললেন, কাগজে পড়েছি। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছেন। ওঁর সঙ্গীরা কিছু বলতে পারছে না। তাইতে মনে হয়, ওঁকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হুঁ, মোটামুটি এইটুকুই জানানো হয়েছে বাইরে। কিন্তু কেসটা অত্যন্ত জটিল। আফ্রিকার একটা দেশের নাম মুরুণ্ডি। ছোট দেশ, লেকিন খুব শক্তিশালী দেশ। পেট্রোল আছে অনেক, তাই অত্যধিক ধনী। সেখানকার প্রেসিডেন্টের ভাই এই সাইমন বুবুম্বা। খুব পাওয়ারফুল ম্যান। সবাই জানে, তিনিই হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। এই সাইমন বুবুম্বা আমাদের দেশে এসেছেন একটা চুক্তি সই করতে।

কাকাবাবু বললেন, জানি। ওদের দেশে তামা আর লোহা পাওয়া যায় না। ওরা ইণ্ডিয়া থেকে তামা আর লোহা কিনবে, তার বদলে দেবে পেট্রোল। এই তো?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, পাঁচশো কোটি ডলারের চুক্তি। ইণ্ডিয়ার খুব লাভ হবে। সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে আমাদের অর্থমন্ত্রীর বেমারি হয়ে গেল। মানে অসুস্থ। বিদেশ মন্ত্রী এখন বিদেশে। সাইমন বুবুম্বা বললেন, কুছ পরোয়া নেহি। অর্থমন্ত্রী সেরে উঠুক, তার মধ্যে আমি কয়েকদিন দার্জিলিংয়ের ঠাণ্ডা খেয়ে আসি। সেইজন্য এলেন কলকাতায়। তারপরেই এই কাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে-করে হোক, তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে!

কাকাবাবু বললেন, দার্জিলিংয়ে খোঁজ করেছ? হয়তো একা-একা সেখানে চলে গেছেন!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, দার্জিলিংয়ে নেই। তিনি আমাদের সরকারের মাননীয় অতিথি। একা-একা কোথাও যেতে পারেন না। সরকারের লোক তাঁকে নিয়ে যাবে, সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড থাকবে। কিন্তু কী হল, কারা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর ঘরে ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ। সাইমন বুবুম্বার বয়েস বেশি না, গায়েও খুব জোর। সহজে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই তাকে চোট দিয়েছে, মেরে আহত করেছে, তারপর ধরে নিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে রক্ত, কতটা চোট দিয়েছে কে জানে!

কাকাবাবু খানিকটা উদাসীনভাবে বললেন, হুঁ! কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি বলো তো?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তোমাকে সাহায্য করতেই হবে।

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু এসব তো পুলিশের কাজ। মানুষ খোঁজা কি আমার পক্ষে সম্ভব নাকি? খোঁড়া পা নিয়ে আমি কি দৌড়াদৌড়ি করতে পারি?

রাজা, তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। এটা শুধু আমার কাজ নয়, এটা দেশের কাজ। সাইমন বুবুম্বার কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দেশেরও বহুত ক্ষতি হয়ে যাবে?

সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা ঠিক আমার কাজ নয়। ভাল-ভাল পুলিশ অফিসারের সাহায্য নাও।

তোমাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। তুমি স্রেফ একটা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করো। যারা ধরে নিয়ে গেছে, তারা যেন বুবুম্বাকে চট করে মেরে না ফেলে। যতদিন সম্ভব তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সেটাই বা আমি কী করে পারব?

কালই চিঠি এসেছে যে, বুবুম্বার মুক্তির জন্য এক কোটি ডলার চাই সাতদিনের মধ্যে। না হলে তাকে মেরে ফেলা হবে। এই এক কোটি ডলার কে দেবে? ওঁর দেশের প্রেসিডেন্ট, ওঁর বড় ভাই ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন, টাকা তিনি দেবেন না। ইন্ডিয়াতে এই কাণ্ড হয়েছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে টাকা দিতে হবে। এদিকে আমাদের দেশে কোনও বন্দিকে মুক্ত করার জন্য টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। সরকার তা দিতে পারে না। মহা বিপদ। অথচ সাতদিন মাত্র সময়। এর মধ্যে যেভাবে হোক, বুবুম্বাকে খুঁজে বার করে উদ্ধার করতে হবে। বুবুম্বাকে যদি মেরে ফেলে, তা হলে সব দোষ হবে আমাদের। সরকারের।

টাকাটা কে চেয়েছে? কোনও বিপ্লবী দল নিশ্চয়ই?

কোনও নাম নেই। লেখা আছে যে, টাকাটা জমা দিতে হবে নেপালে। একটা কাপড়ের দোকানে। সে দোকানদার বলেছে, সে কিছু জানে না। চিঠিটা যে খাঁটি, তার প্রমাণ আছে। চিঠিটার এককোণে সাইমন বুবুম্বার সই আছে, বোঝাই যায় যে তাঁকে দিয়ে জোর করে সই করানো হয়েছে।

তোমরা কি ঠিক করেছ, নেপালে টাকাটা জমা দেওয়ার ছুতো করে ফাঁদ পেতে ওদের ধরবে আর বুবুম্বাকে উদ্ধার করবে?

তার উপায় নেই। টাকাটা দিতে হবে রাত একটায়। ওরা বুবুম্বাকে ছাড়বে পরের দিন সকালে। টাকা দেওয়ার সময় লোকটাকে ধরলেই বুবুম্বাকে মেরে ফেলবে।

এবার সত্যি করে বলো তো নরেন্দ্র, আমার কাছে কী চাও? এর মধ্যে আমার তো কোনও ভূমিকা দেখছি না।

তোমার খুব জরুরি ভূমিকা আছে। তোমাকে একবার মেজর ঠাকুর সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।

মেজর ঠাকুর সিং! সে কে? নামটা বেশ চেনা লাগছে। তার সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক?

মেজর ঠাকুর সিং বিহারের মস্ত বড় জমিদার। অনেক টাকার মালিক। একবার নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটা সুবিধের নয়, কিন্তু ওকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। তোমার মনে আছে, সাত-আট মাস আগে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত নিখোঁজ হয়েছিল, সেবারেও টাকা চাওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত টাকা দিতে হয়নি, বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত নিজেই একজন গুণ্ডার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি চালায়। একজন গুণ্ডাকে মেরে পালিয়ে আসে। যে গুণ্ডাটা মরেছিল, সে ওই মেজর ঠাকুর সিং-এর দলের লোক। কিন্তু ঠাকুর সিং পুরোপুরি অস্বীকার করে। সে বলেছিল, ও লোকটাকে চেনে না, জীবনে কখনও দেখেনি। শেষপর্যন্ত কিছু প্রমাণ করা যায়নি। আমাদের ধারণা, মেজর ঠাকুর সিং এই কারবার করে। ওর বিশাল বাড়ি। সাইমন বুবুম্বাকে ওর বাড়িতে আটকে রাখা আশ্চর্য কিছু নয়। আমরা একটা নামহীন উড়ো চিঠি পেয়েছি, তাতেও বলা হয়েছে যে, সাইমন বুবুম্বার নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে ঠাকুর সিংয়ের সম্পর্ক আছে।

পুলিশ নিয়ে ওঁর বাড়ি সার্চ করলেই তো হয়।

খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হবে, রাজা! যে-কোনও উপায়ে সাইমন বুবুম্বাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঠাকুর সিং অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। আমরা একটু বাড়াবাড়ি করলেই বুবুকে ও খুন করে ফেলতে পারে। সেইজন্যই আমরা চাইছি, তুমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো। তোমার কথা ও শুনবে।

কেন, আমার কথা ও শুনবে কেন? আমার সঙ্গে দেখাই বা করবে কেন?

তোমার সঙ্গে তো ওর আগেই পরিচয় আছে।

কবে আবার পরিচয় হল?

আমাদের কাছে সব রিপোর্ট থাকে। তোমার সঙ্গে মেজর ঠাকুর সিংয়ের দেখা হয়েছে দুবার। একবার কলকাতা থেকে তোমরা দুজনে প্লেনে পাশাপাশি সিটে বসে দিল্লি গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে ঠাকুর সিংয়ের অনেক কথা হয়েছিল, সে তোমাকে কিসমিস আর পেস্তাবাদাম খেতে দিয়েছিল।

আমি কবে প্লেনে কার পাশে বসে গেছি, সে খবরও সি বি আই জানে নাকি?

জানতে হয়, আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়। তোমাকে ফলো করিনি, ঠাকুর সিংকে তখন আমাদের একজন লোক ফলো করছিল। ঠাকুর সিং তোমার এ বাড়িতেও এসেছে। সিপাহি বিদ্রোহের আমলের একখানা দলিল দেখাতে। ওর ধারণা, ওই দলিলে গুপ্তধনের সন্ধান আছে। তুমি অবশ্য বিশেষ পাত্তা দাওনি। তুমি বলেছিলে, গুপ্তধনটন খোঁজা তোমার কাজ নয়। রাজি হওনি, তবে খারাপ ব্যবহার করোনি ওর সঙ্গে। ওকে অপমান করলে ও ঠিক প্রতিশোধ নিত। সুতরাং ঠাকুর সিং তোমাকে অপছন্দ করে না।

এতক্ষণে মনে পড়েছে লোকটার কথা। বিরাট ষণ্ডা-গুণ্ডার মতন চেহারা। কিন্তু কথাবার্তা বলে বেশ ভদ্রভাবে। তুমি বলছ, ও খুব বড়লোক আর জমিদার। প্লেনে আমার পাশে বসে আমাকে বেশ খাতির করেছিল।

তুমি তখন নেপালে, এভারেস্টের পথে একটা বিদেশি গুপ্তচর চক্র আবিষ্কার করে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলে, সমস্ত খবরের কাগজে তোমার নাম আর ছবি, তোমাকে ও চিনে ফেলেছিল।

ওর নাম মেজর ঠাকুর সিং কেন? ও কি কোনওদিন সেনাবাহিনীতে ছিল?

কস্মিনকালেও না। ওদের এক পূর্বপুরুষ ছিল সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক নেতা। সে ভাল বন্দুক চালাত, অনেক ইংরেজ খতম করেছিল। সিপাহিরা তাকে ডাকত মেজরসাব। সেই থেকে ওই বংশের বড় ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের মেজর বলে।

এই ঠাকুর সিং থাকে কোথায়?

তুমি পালামৌ জেলায় বেতলা জঙ্গলের কথা জানো নিশ্চয়ই। সেই বেতলা ফরেস্ট আর ডালটনগঞ্জ শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঠাকুর সিংয়ের বিরাট প্যালেস। প্রায় একটা দুর্গই বলতে পারো। ওর নিজস্ব পাহারাদার বাহিনী আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে, ওই বাড়িটা একেবারে সিংহের গুহা। অচেনা কেউ না বলেকয়ে ভেতরে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারে না। সাইমন বুবুম্বাকে ওখানে আটকে রাখতে পারে!

সন্তু আর জোজো সব কথা শুনছে কান খাড়া করে।

সন্তু জোজোর পাশে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তুই সাইমন বুবুম্বাকে সত্যি দেখেছিস?

জোজো বলল, হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।

আবার দেখলে চিনতে পারবি?

নিশ্চয়ই পারব। আমাদের বাড়িতে এসেছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে।

দশখানা রজনীগন্ধা ডাঁটাসুদ্ধু কাঁচা খেয়েছে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে জোজো ফিক করে হাসল।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, এবার আমাদের প্ল্যানটা বলি শোনো। আজই একটা গাড়িতে করে তোমাকে পাঠানো হবে রাঁচি। সেখানে একটু রেস্ট নিয়ে নেবে। তারপরই সিধা বেলতা ফরেস্ট। ফরেস্ট বাংলোতে তোমার নামে ঘর রিজার্ভ করা থাকবে। গাড়িটাও তুমি সব সময় ব্যবহার করতে পারবে। মনে হবে, তুমি জঙ্গলে বেড়াতে এসেছ, বিশ্রাম নিতে এসেছ। বেড়াতে বেড়াতে তুমি ঠাকুর সিংয়ের বাড়ির সামনে হঠাৎ হাজির হবে। তারপর ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।

কাকাবাবু বললেন, দেখা করার পর?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সেকথাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে, রাজা? তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য। সাইমন বুবুকে যেমন করে তোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এক কোটি ডলার না দিয়ে উদ্ধার করতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, এই প্রস্তাবের একটা অংশ আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় লাগছে। বেতলার জঙ্গলে গিয়ে থাকা। অনেকদিন কোনও জঙ্গলে যাইনি। বেড়াতে যাবি নাকি রে, সন্তু?

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ, যাব। জোজোও যাবে আমাদের সঙ্গে।

৪. বেতলার ফরেস্ট বাংলো

বেতলার ফরেস্ট বাংলোটি ভারী চমৎকার। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, পেছনেই জঙ্গল। এখানে আবার গাছের ওপরেও থাকার ব্যবস্থা আছে। ট্রি-টপ হাউজ। অরণ্যদেবের কমিসে যেরকম আছে। সন্তু আর জোজোর ওই ট্রি-টপে থাকার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু দুখানা ঘরেই লোক এসে আছে আগে থেকে।

বাংলোর সামনে কয়েকটা পোষা হরিণ ঘুরে বেড়ায়। দূরে শোনা যায় হাতির ডাক।

গরম পড়ে গেলেও হাওয়া আছে বেশ। চতুর্দিকে অজস্র ফুল ফুটেছে আর বড় বড় গাছগুলো থেকে ডাকাডাকি করছে কতরকম পাখি।

বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কাকাবাবু একটা ফাইল পড়ছেন। সাইমন বুবুম্বা সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা, এমনকী ওর জীবনী পর্যন্ত। আর বিভিন্ন পোজের তিনখানা ছবি।

সন্তু একটা ছবি তুলে নিয়ে বলল, জোজো, বল তো বুবুম্বাকে কীরকম দেখতে?

জোজো মন দিয়ে ডাল ডিমের ওমলেট খাচ্ছিল। মুখ তুলে বলল, প্রায় ছ ফুট লম্বা, কোঁচকানো চুল, পুরু ঠোঁট, চওড়া বুক, দেখলেই বোঝা যায় গায়ে খুব জোর। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বয়েস হবে চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, গায়ের রং?

একজন আফ্রিকানের গায়ের রং যে জিজ্ঞেস করে, সে একটা মহা বোকা, এইরকম একটা ভাব করে সন্তুর দিকে তাকিয়ে জোজো উত্তর দিল, ছাতার কাপড়ের মতন কুচকুচে কালো! নিগ্রোদের যেরকম হয়।

কাকাবাবু পড়া থামিয়ে কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তুমি যে বর্ণনা দিলে জোজো, তা অধিকাংশ আফ্রিকান সম্পর্কে খাটে। কিন্তু সাইমন বুবুম্বার সঙ্গে মেলেনি। ওর গায়ের রং কুচকুচে কালো নয়। ও হচ্ছে মুলাটো। কাকে মুলাটো বলে জানো?

জোজো তাকাল সন্তুর দিকে।

সন্তু বলল, যার বাবা-মায়ের মধ্যে একজন কালো জাতের আর-একজন ফরসা জাতের, তাকে বলে মুলাটো, মুলাটোরা পুরোপুরি ফরসা বা কালো হয় না।

কাকাবাবু বললেন, সাইমন বুবুম্বার বাবা ব্ল্যাক আফ্রিকান আর মা জার্মান। সাইমনের গায়ের রং মাজা-মাজা, অনেকটা ভারতীয়দের মতন। চুলও বেশি কোঁচকানো নয়। হঠাৎ তাকে দেখলে আফ্রিকান বলে মনেই হয় না।

জোজো কথা ঘোরাবার জন্য বলে উঠল, ওটা কী উড়ে গেল? ময়ূর না? সামনের গাছটায় বসেছে!

সন্তু ভুরু কুঁচকে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জোজো সাইমন বুবুম্বাকে চোখেই দেখেনি। তা হলে গায়ের রং নিয়ে, চুল নিয়ে এত ভুল করত না। কিন্তু সোনালি ফ্রেমের চশমার কথা বলল কী করে? সত্যিই সাইমন বুবুম্বার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। রঙিন ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একটু দূরের গাছটায় ময়ূরটা ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডাকছে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুই আর জোজো এখানে থাক। ইচ্ছে করলে জঙ্গলের মধ্যে বেড়িয়ে আসতে পারিস। আমি একবার মেজর ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা দেখে আসি।

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও যাব ওখানে। জোজো, তুই থাকবি?

জোজো বলল, আমাকে তো যেতেই হবে। সাইমন বুবুম্বাকে যদি ওখানে পাওয়া যায়, আমিই তাকে আইডেন্টিফাই করব।

কলকাতা থেকে যে-গাড়িটায় আসা হয়েছে, সেই গাড়ির ড্রাইভারের নাম মহিম। সে এর মধ্যেই গাড়িটা ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে ফেলেছে। সে বেশ চটপটে যুবক। মাঝে-মাঝে আপন মনে গুনগুন করে গান গায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মহিম, রেডি?

সে বলল, হ্যাঁ সার। বেরোবেন তো চলুন।

ফরেস্ট বাংলোর ম্যানেজারের নাম নুরুল। তিনি সামনের বাগানে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর একটা ফুটফুটে মেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে বাগানের মধ্যে। মেয়েটির বয়েস বছরপাঁচেক হবে, ওর নাম আমিনা। ওকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু নুরুল সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইলেন ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা কোন দিকে।

নুরুল সাহেব বললেন, রূপ মঞ্জিল, জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তা পাবেন। পাঁচ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করবেন? টুরিস্টদের সে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না!

কাকাবাবু বললেন, ঢুকতে না দেয়, বাইরে থেকে দেখে আসব। শুনেছি দারুণ জমকালো বাড়ি।

নুরুল সাহেব বললেন, তা বটে। তবে সাবধান, ও বাড়িতে দুটো সাজ্ঘাতিক কুকুর আছে।

সবাই মিলে গাড়িতে ওঠা হল। একটুখানি যাওয়ার পরেই চেক পোস্ট। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে গেলে গাড়ির নাম্বার লিখে রাখে এখানে।

একটু দূরে যাওয়ার পরই চোখে পড়ল দুটো খয়েরি রঙের খরগোশ দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

সন্তু আর জোজো দুজনেই উত্তেজিত খরগোশ দেখে। জঙ্গলে এসে সবাই জন্তু-জানোয়ার দেখতে চায়। সন্তু বলল, তা হলে পোষা হরিণগুলো ছাড়া একটা ময়ূর আর দুটো খরগো‌েশ দেখা হল এ পর্যন্ত।

মহিম বলল, যদি ভাগ্যে থাকে, হাতিও দেখা যেতে পারে। বাংলোর একজন লোক বলছিল, কাছাকাছি একটা হাতির পাল বেরিয়েছে।

জোজো বলল, না, না, হাতি-টাতি দরকার নেই। অত বড় জন্তু আমার ভাল লাগে না।

সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, জোজো, তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তোমার সেই পিসেমশাই কেমন আছেন, যিনি কোনও জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড় সহ্য করতে পারেন না? আমার ওপর যাঁর খুব রাগ?

জোজো বলল, তিনি বারুইপুরের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। আর কোনও খবর জানি না!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, এই জঙ্গলে বাঘ আছে?

কাকাবাবু বললেন, আছে কয়েকটা। তারা সহজে দেখা দেয় না। তবে, এখানকার সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী কী জানিস? এক ধরনের কুকুর। তাদের বলে ওয়াইল্ড ডগস। দেখতে এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নয়, ছোট-ছোট নেড়িকুত্তার মতন, একসঙ্গে দশ-পনেরোটা থাকে। তারা দল বেঁধে তীরের মতন ছোটে, সামনে কোনও জন্তু পড়লে তার আর নিস্তার নেই। সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে মেরে, খেয়ে শেষ করে দেবে। হরিণ, বুনো শুয়োর, মানুষ সব খায় ওরা। আমি অনেকদিন আগে এখানে একবার এসে

ওয়াইল্ড ডগস দেখেছিলাম। ওইটুকু-ওইটুকু কুকুর, একটা বাইসনকে মেরে সব মাংস খেয়ে ফেলল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

ওরা কি বাঘকেও মারতে পারে?

তা বোধ হয় পারে না। এখানে তো সিংহ নেই, বাঘই বনের রাজা। বাঘের ডাক শুনলেই অন্য সব জানোয়ার ভয় পায়।

অনেকক্ষণ আর কোনও জন্তু দেখা গেল না। শুধু একপাল বানর ছাড়া। যদিও এরা বনেই থাকে, তবু বানরকে ঠিক যেন বন্যপ্রাণী মনে হয় না।

আসল রাস্তাটা ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকতে হল এক জায়গায়। ক্রমশ জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। এক সময় হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দুর্গের মতন বাড়ি।

বাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে নয়, জঙ্গলের ধারেই। একটা টিলার ওপর অনেকখানি পাঁচিল ঘেরা, তার মধ্যে দোতলা বাড়ি। সেই পাঁচিল ও বাড়ি, সবই পাথরের তৈরি। পাঁচিলের এক জায়গায় বিশাল লোহার গেট, তার দু পাশে দুটো গম্বুজ। গেটের কাছে নাম লেখা, রূপ মঞ্জিল।

মহিম গাড়িটাকে নিয়ে এল গেটের কাছে।

খাকি পোশাক আর মাথায় পাগড়ি পরা একজন দরোয়ান রয়েছে সেখানে, হাতে বন্দুক। সে হাত তুলে গাড়িটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেয়া মাংতা?

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে মিষ্টি করে বললেন, নমস্তে। মেজর ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

দরোয়ান মাথা নেড়ে বলল, নেহি হোগা। চলা যাও!

কাকাবাবু বললেন, ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে আমার চেনা আছে।

সে আবার বলল, নেহি হোগা!

কাকাবাবু আরও নরম গলা করে বললেন, আপনি একবার গিয়ে বলুন না, কলকাতা থেকে রাজা রায়চৌধুরী এসেছে। ঠাকুর সিং ঠিক চিনবেন।

লোকটি এবার বেশ রুক্ষভাবে বলল, নেহি হোগা! চলা যাও!

সন্তু আর জোজোও নেমে এসেছে। কাকাবাবু বললেন, কী করব রে? এই লোকটা যে খালি নেহি হোগা, নেহি হোগা বলে!

জোজো বলল, কী উঁচু আর শক্ত দেওয়াল!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই কি লাফিয়ে পাঁচিল ডিঙোবার কথা ভাবছিস নাকি?

জোজো বলল, একখানা বাঁশ পেলে পোল ভল্ট দিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। আমি তো স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি দুবার!

ভেতরে ঘাউ-ঘাউ করে বিকট কুকুরের ডাক শোনা গেল। সন্তু বলল, শুনতে পাচ্ছিস?

জোজো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ডাক শুনেই বোঝা যাচ্ছে খুব বড় কুকুর। আমি বেশ লোমওয়ালা ছোট কুকুর ভালবাসি, বড় কুকুর আমার বিশ্রী লাগে!

কাকাবাবু বললেন, মহা মুশকিল। এ-লোকটা যে কিছুতেই গেট খুলবে না। ঠাকুর সিংকে খবরও দেওয়া যাবে না?

মহিম বলল, ও দরোয়ানজি, একবার ভেতরে যেতে দাও না। ইনি কলকাতার খুব নামজাদা লোক।

দরোয়ান আবার সেই একই কথা বলল, নেহি হোগা। যাও, চলা যাও!

হঠাৎ দূরে কপ কপ শব্দ হতেই সবাই পেছনে ফিরে তাকাল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটি ঘোড়া, তার আরোহীটি যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। কিংবা সিনেমায় এরকম দেখা যায়। লম্বা-চওড়া একজন মানুষ, মাথায় পালক বসানো উষ্ণীষ। হলুদ রঙের মখমলের কুতা-শেরওয়ানি পরা,

এক হাতে একটা রাইফেল, বুকে পৈতের মতন জড়ানো বুলেটের বেল্ট।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লোকটি গেটের কাছে পৌঁছে গেল।

কাকাবাবুদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সে কড়া গলায় দরোয়ানটিকে হিন্দিতে বলল, এরা সব কারা? ভাগিয়ে দিসনি কেন?

দরোয়ানটি এবার বন্দুক বাগিয়ে বলল, যাও!

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, নমস্তে ঠাকুর সিংজি!

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মুখে হরতনের গোলামের মতন গোঁফ, দু দিকে বড় জুলপি, চোখ দুটো লালচে।

মুখে রাগ রাগ ভাবটা একটু-একটু করে বদলে অবাক-অবাক হয়ে গেল। প্রথমে চিনতে পারেনি, তারপর বলল, আরে রায়চৌধুরী সাব? আপনি এখানে?

কাকাবাবু বললেন, চিনতে পেরেছেন তা হলে? যাক। বাঁচা গেল। আপনার দরোয়ান তো কোনও কথাই শুনবে না, আর-একটু হলে গুলি চালিয়ে দিত বোধ হয়! আমরা এই বেতলা ফরেস্টে বেড়াতে এসেছি কয়েকদিনের জন্য। শরীরটা ভাল নেই, তাই বিশ্রাম নিচ্ছি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। কলকাতায় আপনি একবার আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই একটা রিটার্ন ভিজিট দেওয়া উচিত।

ঠাকুর সিং বিগলিতভাবে হেসে বলল, আমার কী সৌভাগ্য! আপনি এসেছেন, আমার গরিবখানা ধন্য হয়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, গরিবখানাই বটে! এটা যদি গরিবখানা হয়, তা হলে প্রাসাদ বলে কাকে?

ঠাকুর সিং বলল, ব্যাপার কী জানেন রায়চৌধুরী সাব, এই জঙ্গলে যত টুরিস্ট আসে, তাদের তো সকালবেলা কোনও কাজ-কর্ম থাকে না, শুধু গাছপালা দেখে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন তারা দল বেঁধে আমার বাড়ি দেখতে আসে। বহুত ঝামেলা হয়। তাই আমি কাউকে ঢুকতে দিই না। কলকাতায় লোকেদের বাড়ি কি যাকে-তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়? ভেতরে আসুন, আসুন। গাড়িটা বাইরে থাক।

এবার গেট খুলে গেল। ঠাকুর সিং ঘোড়া থেকে নামতেই একজন লোক এসে সেটাকে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। এই আমার ভাইপো সন্তু, আর অন্যজন ওর বন্ধু জোজো। দুজনেই কলেজে পড়ে।

ঠাকুর সিং কাকাবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, তোমরা বোলো তো, কার মোচ বড়? আংকেলজির, না আমার? সন্তু আর জোজো দুজনেই বলল, আপনার! ঠাকুর সিং বলল, রায়চৌধুরী সাব-এর মোচটাও বেশ জবরদস্ত। অজকাল তো বাঙালি লোক মোচ রাখেই না। মোচ না থাকলে কি পুরুষমানুষ হয়!

কাকাবাবু বললেন, আপনার বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বুঝি?

ঠাকুর সিং বলল, হ্যাঁ, পুরানা জমানার বাড়ি। একশো বছরের বেশি বয়েস, অনেক জায়গায় ভেঙে পড়ছিল। সব সারিয়েছি, রং করেছি।

কাকাবাবু বললেন, একেবারে নতুনের মতন ঝকঝকে দেখাচ্ছে। এত বড় বাড়ি মেরামত আর রং কাতে বহু টাকা খরচ হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঠাকুর সিং বলল, আপনাদের দয়া!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সেই গুপ্তধন পেয়েছিলেন বুঝি?

ঠাকুর সিং হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, না, সেখানে কিছু ছিল না।

গুপ্তধন না পেলেও ঠাকুর সিংয়ের যে অনেক টাকা তা চারদিক তাকালেই বোঝা যায়। ভেতরে রয়েছে দু খানা গাড়ি। দু পাশে বাগান, তার মাঝে-মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্তি বসানো। বাড়ির সামনের দিকে অনেকখানি শ্বেতপাথরের সিঁড়ি।

দূরে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর সিং কাকে যেন উদ্দেশ করে বলল, এই, কুকুর বেঁধে রাখ।

তারপর কাকাবাবুকে বললেন, আসুন, ওপরে আসুন।

শ্বেতপাথরের সিঁড়িগুলো এমন মসৃণ যে, কাকাবাবুর ক্রাচ পিছলে যাচ্ছে। তবু তিনি কষ্ট করে উঠলেন।

প্রথমে একটা খোলা বারান্দা, তারপর একটা বসবার ঘর। সে ঘরখানা রাজা-মহারাজাদের ঘরের মতন সাজানো। খুব দামি-দামি সোফা-কৌচ, দু দিকের দেওয়ালে ঝুলছে একখানা করে ঢাল আর দু খানা করে তলোয়ার আর কয়েকখানা বড়বড় গোঁফওয়ালা লোকদের আঁকা ছবি।

সবাই বসবার পর ঠাকুর সিং জিজ্ঞেস করল, কী খাবেন বলুন? দুটো হাঁস মেরে রোস্ট করে দেব? হাঁসের রোস্ট খুব বড়িয়া!

কাকাবাবু বললেন, না, না, এই সকালে আমরা মাংস খাব না।

ঠাকুর সিং বলল, তা হলে রাবড়ি খান। খুব ভাল রাবড়ি-মালাই আছে।

কাকাবাবু বললেন, ওরে বাবা, অত মিষ্টি আমি খাই না। ওরা দুজন ছেলেমানুষ, ওরা খেতে পারে।

সন্তু আর জোজো দুজনে জানাল যে, তারাও এখন মিষ্টি খাবে না।

ঠাকুর সিং বলল, তা হলে আলুর পরোটা বানাতে বলি। তার সঙ্গে কলিজার সুরুয়া।

কাকাবাবু বললেন, আমরা খেয়ে এসেছি, সিংজি। অত কিছু খেতে পারব। এক কাপ করে চা খেতে পারি।

ঠাকুর সিং বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চা তো খাবেনই। তার আগে একটু কিছু তো খেতে হবে। গরিবের বাড়িতে এসেছেন।

ঠাকুর সিং ভেতরে গিয়ে কী সব নির্দেশ দিল। একটু বাদেই দুজন উর্দিপরা বেয়ারা প্লেটে করে দু-তিনরকম সন্দেশ, কাজু বাদাম আর বিস্কুট নিয়ে এল। সঙ্গে তিনটে লম্বা গেলাস ভর্তি শরবত। সন্তুর মনে হল, প্লেটগুলো রুপোর।

সে জোজোর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কোনওদিন রুপোর থালায় খাবার খাইনি।

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আবিসিনিয়ার সম্রাট একবার আমাকে আর বাবাকে সোনার প্লেটে করে ফল খেতে দিয়েছিল।

কাকাবাবু বললেন, এত খাবার!

ঠাকুর সিং বলল, খেয়ে নিন, খেয়ে নিন। এ তো অতি সামান্য। আমি রোজ সকালে দু কিলো ভইসের দুধ আর একটা আস্ত হাঁসের রোস্ট খাই!

খেতে-খেতে নানারকম গল্প হতে লাগল। আসল কথার দিকে কাকাবাবু যেতেই পারছেন না।

সন্তু উঠে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছে কাছ থেকে। ঠাকুর সিং বলল, খোকাবাবু, এই কোণের ছবিটা ভাল করে দ্যাখো। ম্যাজিক আছে, ম্যাজিক। দ্যাখো, ছবির মুখ ডাহিন দিকে, পায়ের জুতোও ডাহিন দিকে বেঁকে আছে। এবার এপাশে চলে এসো। ছবির মুখ বাম দিকে ঘুরে যাবে, জুতোও এদিকে ঘুরবে।

সন্তু সরে এসে দেখল, সত্যিই তাই। কিন্তু খুব অবাক হল না। রাজস্থানের একটা দুর্গে সে আগেই এরকম ছবি দেখেছে।

ঠাকুর সিংয়ের ধারণা, শুধু তার কাছেই এরকম ছবি আছে। সে মহা উৎসাহের সঙ্গে বলল, আউর একটা তসবির দেখো।

এই সময় অন্য একটি লোক ঘরে এসে ঠাকুর সিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

শুনতে-শুনতে ঠাকুর সিংয়ের ভুরু কুঁচকে যেতে লাগল। এক সময় সেই লোকটিকে বলল, ঠিক হ্যায়, যাও। আমি আসছি।

তারপর সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

এতক্ষণ ঠাকুর সিং দারুণ ভদ্র আর নম্র গলায় কথা বলছিল। সন্তুর মনে হচ্ছিল, লোকটির চেহারা দশাসই হলেও আসলে সে সরল ও ভালমানুষ ধরনের। এখন ঠাকুর সিংয়ের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কর্কশ গলায় বলল, রায়চৌধুরী, তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ, তাই না? তোমার ড্রাইভার গোপনে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে

পড়েছিল। লুকিয়ে ছবি তুলছিল। ধরা পড়ে গেছে। মারের চোটে স্বীকার করেছে যে, সে পুলিশের লোক। তুমি পুলিশ নিয়ে আমার বাড়িতে কী মতলবে ঢুকেছ?

কাকাবাবু নিরীহ মুখ করে বললেন, তাই নাকি, মহিম পুলিশের স্পাই? তা আমি জানব কী করে? কলকাতা থেকে গাড়ি ভাড়া করে এসেছি, সঙ্গে ড্রাইভার এসেছে।

ঠাকুর সিং বজ্রকণ্ঠে বলল, ফের বাজে কথা? পুলিশ থেকেই এ গাড়ি তোমাকে দিয়েছে। এসো, নিজের কানে শুনবে এসো!

দুমদাম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে আবার বলল, এসো। আমার সঙ্গে!

ভেতরে একটা চৌকো উঠোন, তার একপাশ দিয়ে একটা লম্বা সরু বারান্দা চলে গেছে অনেক দূর। তার পাশে-পাশে ছোট-ছোট ঘর। শেষের দিকের একটা ঘরে কাকাবাবুরা চলে এলেন ঠাকুর সিংয়ের সঙ্গে।

এই ঘরটা তেমন ছোট নয়, হলঘরের মতন লম্বা, সব জানলা বন্ধ, কয়েকটি বেশি পাওয়ারের আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে সন্তু আর জোজো আঁতকে উঠল।

সিলিংয়ের যেখানে পাখা থাকে, সেখান থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে মহিম। মাথাটা নীচের দিকে। দুটো ষণ্ডামাকা লোক দাঁড়িয়ে আছে দু পাশে। তার মধ্যে একজনের দু হাতে দস্তানা পরা, সে ধরে আছে একটা লোহার রড, তার ডগার দিকটা গনগনে লাল।

অন্য লোকটি ঠাকুর সিংয়ের দিকে একটা ভাঁজ করা কার্ড এগিয়ে দিল।

ঠাকুর সিং কাকাবাবুকে বলল, পুলিশের আইডেন্টিটি কার্ড!

তারপর অন্য লোকটির দিকে ইঙ্গিত করতেই সে গরম লোহার রডটা এগিয়ে দিল মহিমের একটা চোখের একেবারে সামনে।

মহিম ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

ঠাকুর সিং দাঁতে দাঁত চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই ক বছর পুলিশে কাজ করছিস? বল, না হলে তোর চোখ গেলে দেব।

মহিম বলল, সাত বছর!

আমার বাড়িতে ঢুকেছিলি কেন? তোকে বাইরে থাকতে বলেছিলাম।

ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল!

ছবি তুলছিলি কেন?

আমার ছবি তোলার শখ। কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, বিশ্বাস করুন!

চোখটা দেব নষ্ট করে? আমার বাড়িতে ঢোকার জন্যই তুই কলকাতা থেকে রায়চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিস, তাই না?

হ্যাঁ। আমায় পাঠিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, সিংজি, এবার ওর বাঁধন খুলে নামিয়ে দিন। ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

ঠাকুর সিং হুংকার দিয়ে বলল, নাঃ! ওকে আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াব!

তারপর দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো দুখানা তলোয়ারের মধ্যে একখানা ফস করে টেনে নিয়ে কাকাবাবুর গলার সামনে ঠেকিয়ে বলল, রায়চৌধুরী, তুমি সিংহের গুহায় মাথা গলিয়েছ! তুমি যদি শুধু মেহমান হয়ে আসতে, অতিথি হয়ে আসতে, তোমাকে আমি মাথায় করে রাখতাম। কিন্তু তুমি পুলিশ নিয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছ। তোমাকে আর ওই বাচ্চা দুটোকে আমি টুকরো-টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলব, আর এখান থেকে জান নিয়ে ফিরতে পারবে না।

কাকাবাবু তলোয়ারটা গ্রাহ্য করলেন না। বাঁ হাত দিয়ে ধরে সেটা সরিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, ঠাকুর সিং, আমার একটা পা খোঁড়া, তাই লোকে ভাবে আমি দুর্বল। হ্যাঁ, আমি দুর্বল, আমি দৌড়তে পারি না। কিন্তু আমার এই হাত দুটোতে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি জোর আছে। আমি চোখ দিয়ে . অন্যদের চেয়ে বেশি দেখতে পাই। আর আমার মাথাটাও বেশি কাজ করে। এর আগে আমি অনেকবার অনেক বিপদের মধ্যে পড়েছি। কেউ আমাকে মারতে পারেনি। তুমি এমনি-এমনি এত সহজে আমাকে মেরে ফেলবে, অত আশা কোরো না।

ঠাকুর সিং বলল, তুমি আগে আমার মতন মানুষের পাল্লায় পড়োনি। আমার শত্রুদের মারতে আমার হাত কাঁপে না।

কাকাবাবু এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গেলেন। ক্রাচ দুটো বগল থেকে সরিয়ে রাখলেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ফুলশার্টের ডান হাতের হাতা গুটিয়ে ফেললেন। ৪০০

তারপর দেওয়াল থেকে অন্য তলোয়ারটা নিয়ে বললেন, আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। কেউ যদি আমার দিকে অস্ত্র তোলে তা হলে তাকে আমি কিছু-না-কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। এসো, লড়ো আমার সঙ্গে।

ঠাকুর সিং ঠিক সিনেমার দৈত্যদের মতন হি-হি-হি করে অট্টহাস্য করে উঠল। হাসতে-হাসতেই বলল, তুমি একটা খোঁড়া বাঙালি, তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ার লড়বে? আজ পর্যন্ত কেউ আমার সামনে দু মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারেনি।

কাকাবাবু বললেন, দেখাই যাক না। যদি মরদ হও, একা লড়া। তোমার লোকদের সরে যেতে বলল। কাপুরুষের মতন সবাই যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

ঠাকুর সিং তার লোক দুটির দিকে চেয়ে বলল, এই, তোরা হঠে যা তো।

আমি এক কোপে এর মুণ্ডুটা নামিয়ে দিই।

ওরা চলে গেল এক কোণে, সন্তু আর জোজো সরে গেল আর এক কোণে।

ঠাকুর সিং আর কাকাবাবুর তলোয়ার-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর সিং জোরে-জোরে কোপ চালাচ্ছে, কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আটকাচ্ছেন।

সন্তু জানে যে, কাকাবাবু এক সময় দুর্দান্ত ফেন্সিং লড়তে পারতেন। তার ছবিও দেখেছে। কিন্তু সে কাকাবাবুর খোঁড়া হওয়ার আগেকার কথা। এখন সে বুঝতে পারল, এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কাকাবাবু ঠিক হাতের জোর পাচ্ছেন না। ঠাকুর সিং ভাল লড়তে জানে, কাকাবাবু ওর মারগুলো আটকাচ্ছেন কোনওরকমে।

দুই তলোয়ারে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে, ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছেন কাকাবাবু।

জোজোর চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে গেছে। সে মিনমিন করে বলল, কী হবে রে?

সন্তু বলল, দ্যাখ না কী হয়!

জোজো বলল, কাকাবাবু হেরে গেলে তো আমরাও...

সন্তু বলল, চুপ।

কাকাবাবু দেওয়ালের গায়ে সেঁটে গিয়ে হাঁফাচ্ছেন, তাঁর তলোয়ারের ওপরে ঠাকুর সিংয়ের তলোয়ার কোনাকুনি আটকে আছে। এখন ঠাকুর সিং সম্পূর্ণ শরীরের চাপ দিলেই কাকাবাবু সম্পূর্ণ হেরে যাবেন।

ঠাকুর সিং আর-এক দফা হাসি দিয়ে বলল, এবার? আমার সঙ্গে লড়ার শখ?

কাকাবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব্যালেন্স করে নিলেন। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে নিজের তলোয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে তলার দিক থেকে এত জোরে আঘাত করলেন যে, ঠাকুর সিং

সামলাবার সময় পেল না। তার তলোয়ার হাত থেকে ছিটকে প্রথমে ঘরের সিলিংয়ে লাগল, তারপর ঝনঝন করে পড়ল মাটিতে।

এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা ঠাকুর সিং ঠিক যেন বুঝতেই পারল না।

কাকাবাবু নিজের তলোয়ার ঠাকুর সিংয়ের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, বলেছিলাম না, আমার চোখ আর মাথা অন্যদের চেয়ে বেশি কাজ করে। এত বড় শরীরের তুলনায় তোমার মাথাটা এখনও তেমন ব্যবহার করতে পারো না, ঠাকুর সিং! নাও, এবার তোমার লোকদের বলল আমার ড্রাইভারকে নামিয়ে দিতে। বেচারার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে।

ঠাকুর সিং ফ্যালফ্যাল করে একবার কাকাবাবুর দিকে, আর-একবার নিজের লোক দুটোর দিকে তাকাল।

সেই লোক দুটো একটা উঁচু টুল এনে মহিমকে নামিয়ে দিল। পায়ের বাঁধন খোলার পরও মহিম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। বসে পড়ল মাটিতে।

কাকাবাবু তলোয়ারটা ঠাকুর সিংয়ের বুক থেকে সরিয়ে আবার ঝুলিয়ে দিলেন দেওয়ালে। এবার জামার তলায় হাত দিয়ে কোমর থেকে বার করলেন রিভলভার।

সেটা দেখিয়ে বললেন, আমার কাছে এটাও ছিল। এটা আমি এক পায়ে দাঁড়িয়েও ভাল চালাতে পারি। তোমাদের রাইফেলের চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি, আর আমার একটা গুলিও ফসকায় না। তুমি যখন তলোয়ার ঠেকালে আমার গলাতে, আমি এক গুলিতে তোমাকে শেষ করে দিতে পারতাম। মনে রেখো ঠাকুর সিং, তুমি যদি মানুষকে মারতে চাও, তা হলে অন্য কেউও যে-কোনওদিন তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

ঠাকুর সিং কথা বলতে পারছে না। এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তার মতন এক বীরপুরুষ একজন খোঁড়া, মধ্যবয়স্ক বাঙালির কাছে তলোয়ার খেলায় হেরে যাবে, এটা

যেন সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। তার অনুচরদের কাছে তার সম্মান অনেকটা কমে গেল!

কপালটা ঘেমে গেছে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ঠাকুর সিং।

তারপর আস্তে-আস্তে বলল, রায়চৌধুরীসাব, তুমি আমাকে হারিয়ে দিলেও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। আমার দশ-বারোজন লোকের হাতে বন্দুক আছে। তারা একসঙ্গে ঘিরে ধরে তোমাদের খতম করে দিতে পারে, তোমার ওই পিস্তল দিয়ে আটকাতে পারবে না। কিন্তু আমি গুণীর ইজ্জত দিতে জানি। তুমি তলোয়ারে আমাকে হারিয়েছ, আমি তার সম্মান দেব। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না, তোমরা ফিরে যাও!

কাকাবাবু বললেন, যাব কী, এখনও তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। এখন তো আর লুকোচুরির কিছু নেই। এখন সোজাসুজি কথা বলা যেতে পারে। তোমার কাছে আমি বিশেষ একটা ব্যাপার, জানতে এসেছি। কিন্তু এ-ঘরে নয়। এখানকার সব জানলা বন্ধ, বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। চলো না, তোমার বৈঠকখানাতেই আবার বসা যাক।

ঠাকুর সিং সবিস্ময়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্তু আর জোজো মহিমের দু হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। মহিমও হাঁ করে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে। যেন, এমন মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি।

৫. সেই জমকালোভাবে সাজানো ঘরটি

আবার এসে বসা হল সেই জমকালোভাবে সাজানো ঘরটিতে।

কাকাবাবু খুব সহজভাবে বললেন, সিংজি, তখন শরবত-টরবত খাওয়ালে, কিন্তু চা খাওয়া হয়নি। এখন কি এককাপ চা পাওয়া যেতে পারে?

কাকাবাবুর গলা শুনে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি। একটু আগে যে দুজনের মধ্যে তলোয়ার নিয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধ হয়ে গেল, ঠাকুর সিং খুনটুনের হুমকি দিয়েছিল, তা যেন কিছুই না।

ঠাকুর সিং হাঁক দিয়ে বলল, কই হ্যায়? চায়ে লাও। আচ্ছাসে কলকাত্তাই চা বানাও!

তারপর সে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আর বলুন?

কাকাবাবু বললেন, তুমি সাইমন বুবুম্বা নামে কারও নাম শুনেছ?

ঠাকুর সিং মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি।

কাকাবাবু বললেন, তুমি জানো, সাইমন বুবুম্বা বিদেশ থেকে এসেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঠাকুর সিং বলল, হাঁ জানি।

কেউ তাকে গুম করেছে। মুক্তিপণ চেয়েছে। এই ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক আছে?

হ্যাঁ, আছে। খুব সম্পর্ক আছে। তাকে তো আমারই জিম্মায় রেখেছি। এই বাড়িতেই।

এবার কাকাবাবুর অবাক হওয়ার পালা। তাঁর ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল। এত সহজে স্বীকার করে ফেলল লোকটা!

দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাকাবাবু বললেন, এ বাড়িতেই আছে? গুড! তবে তো সব ঝামেলাই চুকে গেল। ঠাকুর সিং, সাইমন বুবুম্বার কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দেশের খুব বিপদ হয়ে যাবে। তুমি তাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, দেশ তোমার কাছে ঋণী থাকবে।

ঠাকুর সিং বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলল, ওসব দেশ-ফেশ আমি বুঝি না। তোমাদের মতন শহরের লোকেরা দেশ নিয়ে মাথা ঘামায়। এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে যাও, মাল ডেলিভারি নিয়ে যাও। এটা আমার ব্যবসা।

কাকাবাবু বললেন, তুমি বলছ কী, ঠাকুর সিং! মানুষ চুরি তোমার ব্যবসা? সাইমন বুবুম্বা তোমার কাছে আছে আমরা জেনে গেলাম। এখন তো পুলিশ ডেকে এনে তাকে উদ্ধার করে নিতে পারি।

ঠাকুর সিং বলল, শোনো রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাফ-সাফ সব কথা বলে দিচ্ছি। আমি মানুষ চুরি করি না, মুক্তিপণও আমি নিজের হাতে নিই না। সেসব কারবার অন্য লোক করে। আমি শুধু জিম্মাদার। এখন সারাদেশে যখন-তখন মানুষ গুম হয়। অসমে, বিহারে, পঞ্জাবে, অন্ধ্র প্রদেশে। সেসব অন্য-অন্য পার্টির কাজ। আমার কাছে তারা সেইসব লোকগুলোকে এনে রাখে। আমি তাদের দেখভাল করি। খাওয়াই-দাওয়াই। মুক্তিপণের একটা বখরা আমি পাই, ব্যস!

পুলিশ তোমার হদিস পায়নি?

বিহারের পুলিশের সাহস নেই আমার বাড়ির ধারেকাছে আসে।

কিন্তু সাইমন বুবুম্বাকে যে আমার চাই। তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।

ওসব ফিকির ছাড়ো, রায়চৌধুরী। তোমাকে আর এই বাচ্চা দুটোকে আমি ছেড়ে দেব কথা দিয়েছি, ভালয়-ভালয় ফিরে যাও। দ্বিতীয়বার যদি গণ্ডগোল করো, আমার ব্যবসার ক্ষতি করতে চাও, তা হলে কিন্তু আমি আর ছাড়ব না। কুত্তা দিয়ে তোমাদের খাওয়াব!

ওরে বাবা, খুব যে ভয় দেখাচ্ছ দেখছি।

আমি মিথ্যে কথা বলি না। সাইমন বুবুম্বা একটা স্পেশাল কেস। খুব বড় ব্যাপার। এর পেছনে অনেক বড় কোনও লোক আছে। অনেক টাকার খেলা। তুমি কিছুই করতে পারবে না, রায়চৌধুরী। বাইরের পুলিশ এনেও কোনও লাভ হবে না। আমার বাড়িটা দেখছ তো? পাহাড়ের ওপর। পুলিশের গাড়ি এলে এক মাইল দূর থেকে টের পেয়ে যাব। আমার ওপর অর্ডার আছে, সাইমন বুবুম্বাকে কিছুতেই পুলিশের হাতে দেওয়া হবে না। পুলিশ যদি আমার গেটের কাছে আসে, আমি নিজের হাতে সাইমন বুবুকে কেটে টুকরো-টুকরো করে পেছনে একটা নদীতে ভাসিয়ে দেব। পুলিশ ভেতরে ঢুকলেও কিছু প্রমাণ পাবে না।

এই সময় একজন বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। চায়ের সঙ্গে দু-তিনরকম কেক।

কথার ভঙ্গি পালটে ভদ্রতার সুরে ঠাকুর সিং বলল, চা এসে গেছে, খেয়ে নিন!

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। একটা মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার কথা শোনবার পর কি চা খাওয়া যায়!

কাকাবাবু একটা কাপ তুলে দিব্যি চুমুক দিলেন।

খানিকটা কৌতূহলের দৃষ্টিতে ঠাকুর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি এমন গড়গড় করে সব কথা বলে দিচ্ছ, তাতে আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

সাইমন বুবুম্বা সত্যিই তোমার এখানে আছে? না কি লম্বা-চওড়া কথা বলে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ!

ঠাকুর সিং হে-হে করে হেসে উঠে বলল, নিজের চোখে দেখে যাবে? তা হলে বিশ্বাস হবে? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

ঠাকুর সিং বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কাকাবাবু একটা কেকের টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, হুঁ, বেশ ভালই তো?

সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা খেয়ে নে। এই জঙ্গলেও ভাল কেক বানায়।

এই সময় একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, পিতাজি?

মেয়েটি ভারী সুন্দর। শালোয়ার কামিজ পরা। ফুটফুটে মুখখানি। হরিণীর মতন সরল চোখ মেলে সে ঘরের মধ্যে কাকে যেন খুঁজল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলল, রোশনি!

তারপরই একটা পাখির মতন ফুড়ত করে চলে গেল।

ঠাকুর সিং ফিরে এল মিনিট দশেক পরে। বলল, চলো আমার সঙ্গে!

কাকাবাবু বললেন, একটু আগে একটি বাচ্চা মেয়ে উঁকি মেরে গেল। রোশনি। সে কি তোমার মেয়ে?

ঠাকুর সিং বলল, হ্যাঁ। সে এসেছিল বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, কী সুন্দর দেখতে তোমার মেয়েকে। আচ্ছা ঠাকুর সিং, তোমার এই মেয়েকে যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, তারপর তোমার কাছে মুক্তিপণ চায়, না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, তা হলে তোমার কেমন লাগবে?

ঠাকুর সিং রুক্ষ স্বরে বলল, ওসব বাত ছাড়ো। ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। তার মধ্যে আবার ছেলেমেয়ের কথা আসে কী করে? লোকে তো যুদ্ধ করতে গিয়েও মানুষ মারে। নিজের ছেলেও কোনও যুদ্ধে মরতে পারে ভেবে কেউ কি যুদ্ধ বন্ধ করে?

একটু থেমে সে আবার হিংস্র গলায় বলল, আমার মেয়ে রোশনি, একটা ফুলের মতন মেয়ে, তার গায়ে যদি কেউ হাত ছোঁয়ায়, আমি তার কলিজা ছিঁড়ে নেব। ভীমের মতন আমি তার রক্ত খাব!

আগের দেখা বারান্দাটা এল-শেপের মতন বেঁকে গেছে। সেখানে একটা ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল ভেতরে আর-একটা দরজা। তারপরে লোহার গরাদ দেওয়া একটা জেলখানার মতন।

সেই ঘরটা আধো-অন্ধকার। সেখানে একটা খাটিয়ার ওপর একপাশ ফিরে শুয়ে আছে একজন মানুষ। জিন্স আর হলুদ গেঞ্জি পরা। দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ। লোকটি ঘুমিয়ে আছে। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা পাশে খুলে রাখা।

সন্তু জোজোর দিকে তাকাল।

জোজো মাথা নেড়ে বলল, ইয়েস!

ঠাকুর সিং বলল, আমরা ভাল খেতে দিই। যত্ন করি। খুব ভাল হোটেলেও এরকম যত্ন পাবে না।

কাকাবাবু ডেকে উঠলেন, সাইমন, সাইমন!

ঠাকুর সিং বলল, ডেকে কোনও লাভ নেই। আফ্রিকানদের কীরকম ঘুম তুমি জানো না। ঠিক কুম্ভকর্ণের মতন। একবার ঘুমোলে সাত ঘন্টার আগে চোখ মেলবে না। এখন তুমি বোমা ফাটাও এখানে। তাও জাগবে না।

সেই বারান্দার একটা দরজা আছে বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে। ঠাকুর। সিং কাকাবাবুদের নিয়ে এল সেখানে। এর মধ্যে টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে।

ঠাকুর সিং বলল, তা হলে তোমাদের গাড়িটা ভেতরে আনতে বলি! গেট পর্যন্ত যেতে গেলে ভিজে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ! ঠাকুর সিং, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। সাইমন বুবুম্বাকে এখানে দেখে গেলাম। তাকে যে-কোনও উপায়ে আমি উদ্ধার করার চেষ্টা করবই। হাল ছেড়ে দেব না, বুঝতেই পারছ! হি ইজ টু-উ-উ ইমপর্টান্ট!

ঠাকুর সিং বলল, রায়চৌধুরী, তোমাকেও আমি বলে দিচ্ছি, তুমি আমার এখান থেকে ওই লোকটাকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না। কিছুতেই না। আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তোমাকে। তবে আবার তুমি যদি এ বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করো, তখন কিন্তু আমি আর ছাড়ব না। তোমাকেও জানে মেরে দেব!

কাকাবাবু বললেন, অল রাইট। চ্যালেঞ্জ রইল।

মহিম গাড়িটা চালিয়ে আনল এদিকে। সবাই উঠে গেল। ঠাকুর সিং বলল, জঙ্গলে ঘোররা। জানোয়ার দেখো, এদিকে আর এসো না!

কাকাবাবু বললেন, শিগগির তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

গাড়িটা গেট পার হওয়ার সময় দরোয়ান কী যেন একটা ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। একটা কালো বলের মতন। সবাই চমকে উঠল। জিনিসটা পড়েছে। জোজোর কোলের ওপর, সে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে, বোমা, বোমা, গাড়িটা উড়িয়ে দেবে।

জোজো দু হাত দিয়ে সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

সন্তু নিচু হয়ে টপ করে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর বলল, এ তো একটা ক্যামেরা।

মহিম ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কামেরা? আমারটা কেড়ে নিয়েছিল। ফেরত দিয়েছে।

সন্তু সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, ভাঙেটাঙেনি, ঠিকই আছে।

কাকাবাবু বললেন, ওঃ, তোরা এমন চেঁচিয়ে উঠলি, আমি ভাবলাম সত্যিই বুঝি বোমা। আর-একটু হলে গাড়ির দরজা খুলে লাফাতে যাচ্ছিলাম!

জোজো বলল, একবার কম্বোডিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় সত্যিই আমাদের গাড়ির মধ্যে একটা জ্বলন্ত বোমা ছুড়ে দিয়েছিল ডাকাতরা। সেইজন্যই আমি ভাবলাম...

সন্তু বলল, সেবারে বোমায় তোদের গাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু তোদের গায়ে একটাও আঁচড় লাগল না, তাই তো?

জোজো বলল, মোটেই তা নয়। আমাদের গাড়িতে এক টিন নারকোল তেল ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই টিনের সবটা তেল ঢেলে দিলাম বোমার ওপর। অমনই সেটা ফুস করে নিভে গেল। নারকোল দিয়ে ভেজালে কোনও বোমা ফাটতে পারে না, জানিস না?

সন্তু তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু থেমে বললেন, কী জানি! কোনওদিন তো বোমার ওপর নারকেল তেল ঢেলে দেখিনি। বোধ হয় আর্মির লোকেরাও এই টেকনিকটা জানে না।

সন্তু পেছন ফিরে ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা আর একবার দেখবার চেষ্টা করে বলল, উঃ, সত্যিই যেন সিংহের গুহা! যখন দেখলাম মহিমাকে বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে-

জোজো বলল, আর কাকাবাবু যখন তলোয়ার লড়তে গেলেন, তখন এত ভয় করছিল ..

কাকাবাবু বললেন, ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। আমার আত্মবিশ্বাস জিনিসটা খুব স্ট্রং, বুঝলে জোজো! লোকে বলে জেদ্ কিংবা গোঁয়ার্তুমি। জিতব জেনেই তলোয়ারটা হাতে নিয়েছিলাম। সে যাকগে! সাইমন বুবুকে। আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখলাম। ওকে উদ্ধার করার একটা উপায় বার করতেই হবে।

বাংলোয় ফিরে এসে কাকাবাবু টেলিফোন নিয়ে বসলেন। এখানে একটা টেলিফোন আছে বটে, কিন্তু লাইন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু কাকাবাবু চেষ্টা করে যেতে লাগলেন অনবরত।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার সময় কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, তোরা এই জঙ্গলের মধ্যে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে পারিস, খবদার, বেশি দূরে যাবি না। ওয়াইল্ড ডগসের ভয় আছে।

সন্তু বলল, আমরা গাড়ি করে গেলেও কি ওয়াইল্ড ডস কিছু করতে পারবে?

কাকাবাবু বললেন, তা পারবে না বটে। কিন্তু ঠাকুর সিং তোদর একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তাতে আরও মুশকিলে পড়ে যাব। গাড়িতে গেলেও কাছাকাছি থাকবি।

খাওয়া সেরেই সন্তু আর জোজো ছুটে গেল মহিমের কাছে। তার ঘরটা একটু দূরে। মহিম শুয়ে-শুয়ে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও শুনছে। সন্তু বলল, মহিমদা, চলো না আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

মহিম কাতর মুখ করে বলল, সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথা দপদপ করছে। আমি এখন গাড়ি চালাতে পারব না।

ওরা দুজনে মহিমের দু পাশে দাঁড়াল।

সন্তু বলল, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

মহিম বলল, না, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ খেয়েছি! তোমরা এখানে থেকে কী করবে!

মহিমকে ঘুমোতে দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। এখন আর ওদের কিছুই করার নেই। রোদ ঝাঁঝাঁ করছে। অন্য আর কোনও টুরিস্ট আসেনি, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। একঝাঁক টিয়াপাখি ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল।

একটু দূরে একটা বড় শিমুলগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল দুজনে।

সন্তু বলল, দ্যাখ জোজো, তুই যে সেদিন ভোরবেলা এসে সাইমন বুবুম্বার কথা বললি, তখন আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি। তারপর জানা গেল, সত্যিই আফ্রিকা থেকে ওই নামে একজন এসেছে। তাকে গুম করা হল। একটু আগে তাকে আমরা দেখেও এলাম। কিন্তু আমার একটা চিন্তা হচ্ছে। ঠাকুর সিং কি ওকে পিন হেড মাশরুম কিংবা পিংক রজনীগন্ধা ফুল খাওয়াতে পারবে? সেসব কি এখানে পাওয়া যায়?

জোজো বলল, তা হলে ডিমসেদ্ধ খাবে। মধুর অভাবে গুড়ও খেতে হয় জানিস না?

সত্যি করে বল তো, সাইমন বুবুম্বা কাঁচা-কাঁচা ফুল খায়?

আফ্রিকানরা অনেক জিনিস কাঁচা খায়। সেইজন্যই ওদের স্বাস্থ্য এত ভাল। আমরাও তো ফুলকপি কাঁচা খেতে পারি। টমাটো কাঁচা খেতে পারি। পারি না?

জোজো, এখানে শুধু তুই আর আমি আছি। আমার সামনে তোর গুল ঝাড়ার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করব, স্পষ্ট সত্যি বলবি। সাইমন বুবুম্বা সত্যি-সত্যি তোদের বাড়িতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ, একদিন সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ছিলেন প্রায় দেড় ঘন্টা।

তুই সব জিনিসই অনেকটা বাড়িয়ে বলিস, তাই না? সন্ধেবেলা এসেছিলেন দেড় ঘন্টার জন্য। আর তুই বলেছিলি, তোদের বাড়িতে থাকছেন, সকালে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু তোদের বাড়িতে এসেছিলেন, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তবু কেন তুই আজ বললি যে সাইমন বুবুম্বার গায়ের রং কুচকুচে কালো?

আসল ব্যাপারটা বলি। উনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়নি। আমি বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, আফ্রিকার একটা দেশের প্রেসিডেন্ট বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছে।

প্রেসিডেন্ট নয়। প্রেসিডেন্টের ভাই।

ওই একই হল। পরে তো প্রেসিডেন্ট হবে। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। আর সামনের ঘরে কুচকুচে কালো একজন আফ্রিকান বসে আছে। সে সাইমন বুবুম্বার সেক্রেটারি। সুতরাং তাকে দেখে আমি ধরেই নিলাম, বুবুম্বারও রং ওইরকম কালোই হবে। সে যে মুলাটো না ফুলাটো, তা জানব কী করে?

তোর সঙ্গে তা হলে দেখাই হয়নি?

বাবার ঘরের পেছন দিকে একটা দরজা আছে। তাতে এক চুল ফাঁক। খুব বিখ্যাত কোনও লোক এলে ওই দরজার ফাঁকে আমি আড়ি পাতি। একটু-একটু দেখা যায়, একটু-একটু কথা শোনা যায়। সাইমন বুবুম্বা সেদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। টুকরো-টুকরো কথা শুনে বোোঝা গেল, কবে প্রেসিডেন্ট হবে তা জানতে চায়। বাবা কী সব ধারণটারন করতে বললেন, আর একটা মুন স্টোনের আংটি দিলেন।

উনি বেরোবার সময়েও তুই দেখতে পাসনি?

একটু সময়ের জন্য আমি বাথরুমে গিয়েছিলুম, তার মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন যে। আমি বাথরুম শেষ করে আসতে-আসতে উনি গাড়িতে উঠে বসেছেন। কিন্তু ওঁর সেই

সেক্রেটারি আবার নেমে এসে বলল, মিঃ বুবুম্বা চশমাটা ফেলে গেছেন। বাবা আমাকে একটা সোনালি ফ্রেমের চশমা দিয়ে বললেন, এইটা দিয়ে দে, জোজো!

তোর এই গল্পটার কতটা সত্যি?

সেটা তুই নিজে বুঝে দ্যাখ!

তুই কথায় কথায় এত বেশি বানাস কেন, জোজো? সোজাসুজি সত্যি কথা বলতে পারিস না?

আমি তোদের মতন অর্ডিনারি হতে চাই না! আমার যা মনে আসে তাই বলি। আমার মনটা বিরাট।

ওই মুন স্টোনের কথাটা শুনেই বুঝি তুই চাঁদের পাথরের আইডিয়াটা পেয়ে গিয়েছিলি?

আইডিয়াটা কেমন ছিল বল? ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে, এমনকী জি সি বি পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল। এরকম দুর্দান্ত প্র্যাকটিক্যাল জোক কজন করতে পারে?

হ্যাঁ, অনেক দূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু মিউজিয়াম থেকে পাথরটা চুরি যাওয়ায় তোর জোকটা প্র্যাংক হয়ে গেল। তাই তো নাসির সাহেবের কাছে ধমক খেয়ে তুই প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলি।

কাঁদিনি রে, কাঁদিনি! ওটা অভিনয়। মাঝে-মাঝে কান্নার অভিনয়টা প্র্যাকটিস করতে হয়।

আর-একটা কথা বল তো দিল্লি থেকে নরেন্দ্র ভার্মা যখন এসে কাকাবাবুকে সাইমন বুবুম্বার উধাও হয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন তখন তুই। একবারও জানালি না কেন যে, উনি তোদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, বলে আবার একটা ঝামেলায় পড়ি আর কী! একে তো নাসির সাহেব চাঁদের পাথর নিয়ে অত জেরা করে গেলেন, তারপর নরেন্দ্র ভার্মা আবার জেরা শুরু করে দিতেন!

জেরায় জেরায় আমি জেরবার হয়ে যেতাম। তা ছাড়া, সাইমন বুবুম্বা আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এটা তো একটা নিছক ঘটনা। ফ্যাক্ট! শুধু ফ্যাক্ট বলায় আমার কোনও উৎসাহ নেই।

দেখতে-দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর ঝড় উঠল। খানিকক্ষণ। বারান্দায় বসে ঝড় দেখতে দারুণ লাগে। গাছের ডালগুলো মড়মড় করবে। অসংখ্য ঝরা পাতা উড়ছে সামনের মাঠে। একসঙ্গে গোটা দুয়েক বড় কোনও জন্তু হুড়মুড় করে চলে গেল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

এখানে খবরের কাগজ আসে না। বাইরের খবর জানার একমাত্র উপায় রেডিও। রেডিওতে শোনা গেল, অসমের চা বাগান থেকে আবার একজন ম্যানেজারকে কারা যেন জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। চাঁদের পাথরটার এখনও হদিস পাওয়া যায়নি। পঞ্জাবে খুব গণ্ডগোল চলছে। সাইমন বুবুকে খোঁজা হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। পুলিশ দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সাইমন বুবুষার সঠিক খবর যে দিতে পারবে, সে পাবে। প্রধানমন্ত্রী জরুরি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন, আজ রাত্তিরে আরও ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।

খবর শুনে জোজো বলল, ওই দশ লক্ষ টাকা তো আমাদেরই পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমরা সাইমন বুবুম্বাকে বন্দি অবস্থায় একটা বাড়িতে দেখেছি। এটা তো সঠিক খবর।

সন্তু বলল, আমরা যে দেখেছি, তার প্রমাণ কী?

বাঃ, আমরা তিনজন দেখেছি। স্পষ্ট দেখেছি। দশ লক্ষকে তিন দিয়ে ভাগ কর। থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি থ্রি লাখ টাকা আমিও পাব কিন্তু?

দাঁড়া, দাঁড়া জোজো। তুই যে আগেই কালনেমির লঙ্কা ভাগ করতে বসে গেলি। নিজের চোখে দেখাটাই প্রমাণ নয়। আমাদের দেওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ যদি ওকে উদ্ধার করতে পারে, তাকেই বলে প্রমাণ। কিন্তু পুলিশকে যেতে দেখলেই ঠাকুর সিং হয় সাইমন বুবুম্বাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই কোথাও সরিয়ে ফেলবে কিংবা মেরে কেটে কুচি কুচি করে

নদীতে ভাসিয়ে দেবে। কোনও প্রমাণ থাকবে না। গেটের দু পাশে দুটো গম্বুজ দেখিসনি? নিশ্চয়ই ওর ওপর উঠে রাত্তিরবেলা ওরা নজর রাখে। ওই টিলায় ওঠার আর কোনও রাস্তা নেই।

জোজো বিরক্তির সঙ্গে বলল, দূর ছাই!

কাকাবাবু বারবার শুধু সাইমন বুবুম্বার ফাইলটা পড়ে যাচ্ছেন আর। টেলিফোনে লাইন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ওদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছেন না।

রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া চুকে গেল তাড়াতাড়ি। কাকাবাবু শুতে চলে গেলেন।

সন্তু আর জোজো এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চায় না। ওরা গল্প করতে লাগল বারান্দায় বসে। ঝড় তেমন প্রবল নয়, হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ শব্দে। তার সঙ্গে মিশে আছে উড়ন্ত বৃষ্টি।, রাত যখন প্রায় এগারোটা, তখন একটা গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ওদের গাড়িটা রয়েছে একটা গাছের নীচে। এত রাত্রে সেটা চালাতে চাইছে। কে? কোনও চোর নাকি?

সন্তু আর জোজো দুজনেই ছুটে গেল।

না, চোর নয়। মহিমই বসে আছে স্টিয়ারিংয়ে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এ কী মহিমা, তোমার শরীর খারাপ, এখন কোথায় যাচ্ছ?

মহিম বলল, শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। একটু ঘুরে আসব।

সন্তু বলল, আমরাও যাব। এই সময় অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখা যেতে পারে।

মহিম এবার গম্ভীরভাবে বলল, না, তোমরা যাবে না।

কেন, আমরা যাব না কেন?

আমি জঙ্গলে যাচ্ছি না। আমি যেখানে যাচ্ছি...তোমাদের বিপদে ফেলতে চাই না। আমাকে একাই যেতে হবে।

অ্যাঁ? তুমি ঠাকুর সিংয়ের বাড়ি যাচ্ছ? পাগল হয়েছ নাকি?

মোটেই পাগল হইনি। রেডিওতে শুনলাম দশলাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব।

সকালবেলা তুমি ধরা পড়ে গেলে, তারপর ওই কাণ্ড হল। আবার তুমি একা যাচ্ছ?

এবার সাবধান হয়ে যাব। শোনো, দশ লক্ষ টাকা পেলে আমি মধ্যমগ্রামে একটা ছোট বাড়ি বানাব। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাকি টাকায় একটা রেডিওর দোকান খুলব। বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটবে। এই দশ লক্ষ টাকার জন্য একটা বড়রকমের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। যদি লুলুম্বা সাহেবকে উদ্ধার করতে পারি–

লুলুম্বা নয়, বুবুম্বা।

ওই যা হোক। আফ্রিকার রাজার ভাইটাকে যদি একা উদ্ধার করতে পারি, পুলিশের টাকা তো পাবই, ওই কালো সাহেবও নিশ্চয়ই আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন নিজে থেকে।

কিন্তু তুমি একা পারবে কী করে?

গাড়ি নিয়ে পুরোটা যাব না। টিলার নীচে রেখে দেব। চুপিচুপি পায়ে হেঁটে উঠব। পাঁচিলের এক জায়গায় খানিকটা নীচু আছে, সকালে দেবে রেখেছি, সেখান দিয়ে ঢুকব।

ভেতরে দুটো ভয়ঙ্কর কুকুর আছে।

সে ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। ডিনারে যে মাংস দিয়েছিল, খাইনি, রেখে দিয়েছি। খুব কড়া ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে। সেই ওষুধ মেশান মাংস ছুঁড়ে দেব আগে। কুকুর দুটো খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। আর যে দশ বারোজন লোক বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?

তাদেরও ঘায়েল করার উপায় আছে। কলকাতা থেকেই বড় এক শিশি ক্লোরোফর্ম নিয়ে এসেছি। রুমালে ক্লোরোফর্ম ভিজিয়ে এক-একটা লোককে পেছন থেকে ধরে-ধরে অজ্ঞান করে দেব।

মহিমা, এসব সিনেমায় হয়। বাস্তবে হয় না। কেউ না কেউ তোমায় ধরে ফেলবে।

বাস্তবে যা হয়, সিনেমাতে তাই-ই দেখায়। সরে যাও, সন্তু, এই দশ লক্ষ টাকা আমার চাই।

সন্তু এবার হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে বলল, তোমাকে একা কিছুতেই যেতে দেব না। আমরাও যাব। চল, জোজো ওঠ।

জোজো বলল, আমাকে মাফ করো, ওই সিংহের গুহায় আমি যেতে চাই না। এমনই দশ-বারোজন গুণ্ডাকেও আমি ভয় পাই না। রদ্দা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। কিন্তু বড় বড় কুকুর, একটু ওষুধ মেশানো মাংস খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

সন্তু বলল, ঠিক আছে, তুই থাক। কাকাবাবুকে ম্যানেজ করিস, যেন জানতে না পারেন। আমি যাব মহিমদার সঙ্গে।

মহিম বলল, যেতে পারো এক শর্তে। যদি সাকসেসফুল হই, তুমি কিন্তু ওই দশ লাখ টাকার ভাগ চাইবে না। তুমি ছেলেমানুষ, পরে অনেক রোজগার করতে পারবে।

সন্তু বলল, না, না, আমার টাকা চাই না। জোজো বলল, আমাদের দুজনকে অন্তত একলাখ করে দিও। সন্তু বলল, মহিমা, তোমার কাছে ছুরিটুরি আছে কিছু? মহিম বলল,

না। সন্তু বলল, একটা অন্তত সঙ্গে রাখা দরকার। অন্তত যদি দড়ি-টড়িও কাটতে হয়..আমার একটা ভোজালি আছে, নিয়ে আসব?

মহিম বলল, যাও, চটপট আনো। আর যদি একটা টর্চ আনতে পারো ভাল হয়। আমার কাছে টর্চও নেই।

সন্তু দৌড়ে বাংলোয় ফিরে গেল। সে আর জোজো এক ঘরে শোয়। ভোজালিল সে-ঘরেই আছে। কিন্তু টর্চটা কাকাবাবুর কাছে। একটা টর্চ লতা লাগবেই।

কাকাবাবুর ঘরের দরজাটা আস্তে করে ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। কাকাবাবুর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সন্তু পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে এল।

টর্চটা কাকাবাবুর শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা আছে, সন্তু আগেই দেখেছে। অন্ধকারে আন্দাজে চলে এল সেখানে। টর্চটা তুলে নিল। কাকাবাবু জাগেননি।

দরজা পর্যন্ত ফিরে আসতেই কাকাবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, টর্চ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস এখন?

সন্তু থমকে গেল, তার বুক কেঁপে উঠল।

অপরাধীর মতন বলল, একটু মহিমদার সঙ্গে ঘুরে আসতে যাচ্ছি। কাকাবাবু বললেন, এত রাত্রে! আমাকে না বলে? তোকে বারণ করেছিলাম না?

মহিমা যে যেতে চাইছে। একা-একা। তাই আমি-

মহিম কোথায় যেতে চাইছে?

ওইখানে?

মানে, ঠাকুর সিংয়ের বাড়িতে? ইডিয়েট! শিগগির ডেকে নিয়ে আয় মহিমকে। বলবি, নরেন্দ্র ভার্মা গাড়িটা আমার ব্যবহারের জন্য দিয়েছে। আমার হুকুম ছাড়া মহিম গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কে? যা, তাকে ধরে নিয়ে আয়?

জোজো আর সন্তুর সঙ্গে মহিম যখন এ-ঘরে এল, তখন আলো জ্বলে গেছে, কাকাবাবু বিছানায় উঠে বসেছেন।

কাকাবাবু সাধারণত নিজের লোকদের কড়া গলায় কথা বলেন না। এখন তিনি বেশ রেগে গেছেন বোঝা গেল। মুখখানা থমথমে হয়ে আছে। প্রচণ্ড ধমকের সুরে তিনি বললেন, কোন সাহসে তুমি আমাকে না বলে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলে?

মহিম গোমড়ামুখে বলল, ঠিক আছে, আমি গাড়ি নেব না। পায়ে হেঁটেই যাব।

কাকাবাবু আরও জোরে বললেন, দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা শুনে বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সকালে ধরা পড়ে কোনওক্রমে বেঁচে গেছ। এবার ধরা পড়লে ওরা একটুও দয়া মায়া দেখাত না। প্রাণেই যদি বাঁচতে না পারো, তা হলে পুরস্কারের টাকাটা ভোগ করবে কী করে? নিজের ক্ষমতা না বুঝে যারা বিপদে ঝাঁপ দেয়, তারা বেঘোরে মরে!

মহিম এবার চুপ করে গেল।

কাকাবাবু বললেন, ওইভাবে যদি লোকটাকে উদ্ধার করা যেত, তা হলে আমিই কি সে-চেষ্টা করতাম না? ঠাকুর সিং ওই লোকটাকে দেখিয়ে দিল তো ওইজন্যই। যাতে আমরা রাত্তিরে আবার ঢোকার চেষ্টা করি আর গুলি খেয়ে মরি। আমি অন্য একটা পরিকল্পনা করছি, এর মধ্যে তোমরা ওর খপ্পরে পড়ে গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

এবার সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, তুই এত বোকা হয়ে গেলি কী করে, সন্তু! আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমার ঘরে ঢুকে কেউ কিছু নিয়ে চলে যাবে, অথচ আমি জাগব না, এরকম কখনও হয়েছে আগে?

জোজো বলল, আমি শেষপর্যন্ত ওদের যেতে দিতাম না, কাকাবাবু! ওরা দুজনে যখন কথা বলছিল, ততক্ষণে আমি গাড়ির চাবিটা টুক করে সরিয়ে ফেলেছিলাম!

৬. সকালটা বেশ সুন্দর

সকালটা বেশ সুন্দর। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। গাছগুলোর পাতা সব ধোওয়া, ঝকমকে সবুজ। আজও একটা ময়ূর এসে ডাকছে। পোষা হরিণগুলো ঘুরছে আপন মনে।

বারান্দায় বসেই চা খাওয়া হয়ে গেছে একটু আগে। এঁটো কাপ-ডিশগুলো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কাকাবাবু গেছেন বাথরুমে। ম্যানেজার নুরুলসাহেব গল্প করছেন সন্তুদের সঙ্গে।

নুরুলসাহেবের পাঁচ বছরের মেয়ে আমিনা খেলা করছে সামনে। সে ছুটে-ছুটে একটা প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করছে। চার- পাঁচ রকমের রঙিন ফ্রক পরা মেয়েটি নিজেও যেন একটা প্রজাপতি।

একটা জিপগাড়ি এসে থামল বাগানের পাশে। তার থেকে নামল একটা গাঁট্টাগোট্টা লোক, এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে।

আমিনা প্রজাপতির দিকে চেয়ে-চেয়ে ছুটছে, অন্য কিছু দেখছে না, সেই লোকটার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল বেশ জোরে।

এরকম ধাক্কা লাগলে যে-কোনও লোক ছোট মেয়েটিকে আদর করে কিংবা কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে যে তার লেগেছে কি না। কিন্তু এই লোকটা বিরক্তভাবে আমিনাকে জোরে ঠেলে দিল, সে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কেঁদে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

নুরুলসাহেব মেয়েকে ধরতে গেলেন না, লোকটিকেও কিছু বললেন না।

প্রচণ্ড রাগে সন্তুর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। লোকটা আর একটু কাছে আসতেই সন্তু অন্য কিছু আর চিন্তা না করে ছুটে গিয়ে লোকটির মুখে খুব জোরে একটা ঘুসি কষাল।

লোকটা ধড়াম করে পড়ে গেল চিত হয়ে। এক ঘুসিতেই প্রায় অজ্ঞান। ঘুসিটা লেগেছে ঠিক নাকের ডগায়। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

নুরুলসাহেব আঁতকে উঠে বললেন, এ কী করলে ভাই? সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ওকে মারলে?

সন্তু হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, মারব না, নিশ্চয়ই মারব।

জোজো বলল, বেশ করেছে মেরেছে। ও না মারলে আমি নিজেই ওর মাথাটা একটা নারকোলের মতন ফাটিয়ে দিতাম।

জোজো ছুটে গিয়ে আমিনাকে মাটি থেকে তুলে নিল।

নুরুলসাহেব বললেন, ও লোকটা কতার সিং! তোমরা চেনো না। ঠাকুর সিংয়ের ডান হাত!

সন্তু বলল, ডান হাত, বাঁ হাত যাই-ই হোক, ওইটুকু একটা মেয়েকে মারলে শাস্তি দিতে হবে না?

নুরুলসাহেব ভয়ে আমসির মতন মুখ করে বললেন, ওদের চটালে আমি যে এখানে চাকরিই করতে পারব না। ওরা যা ইচ্ছে তাই-ই করে। শিকার করা নিষেধ, তবু জঙ্গলে গিয়ে হরিণ মারে, খরগোশ মারে। আমার এখানে খাবার নিতে আসে মাঝে-মাঝে। যক্ষুনি যা চাইবে, দিতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে।

কতার সিং উঠে বসল আস্তে-আস্তে। জ্বলন্ত চোখে তাকাল সন্তুর দিকে। দাঁত কিড়মিড় করে কী যেন একটা খারাপ গালাগালি দিল।

সন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই রইল, সরল না এক চুলও।

কর্তার সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কুত্তার বাচ্চা, তোকে জানে মেরে দেব।

সন্তু দুটো হাত মুঠি করে বুক আড়াল রেখে বলল, আও না, আও! তোমাকে আরও শিক্ষা দেব আমি।

সন্তুর তুলনায় কতার সিংয়ের শরীর অন্তত আড়াইগুণ বড়। সন্তুকে দেখলে মনেই হয় না তার গায়ে খুব জোর আছে। সে মাল-টাল ফোলায় না। প্যান্ট আর শার্ট পরা সাধারণ চেহারা। কিন্তু বক্সিং সে ভাল জানে।

কতার সিং বক্সিংটক্সিংয়ের ধার ধারে না। একটা ঘুসি খেয়েই সে সন্তুর মুঠোর ওজন বুঝে গেছে। সে আর ও লাইনে গেল না।

বাঁ হাত দিয়ে সে মুখের রক্ত মুছল। ডান হাতে ঝাঁ করে একটা ছুরি বার করল।

সন্তু তবু পালাল না। তার সিংয়ের চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। এরকম একটা আসন্ন লড়াইয়ের দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

জোজো বলল, ওই লোকটা অমানুষ। বাচ্চা মেয়ে আমিনাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সন্তু রেগে গিয়ে ওর নাকে একটা ঘুসি মেরেছে বলে এখন ও ছুরি তুলেছে। কাওয়ার্ড কোথাকার! রোদ্দুরে কতার সিংয়ের স্থবির ফলাটা চকচক করে উঠল।

কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই চট করে ঘর থেকে রিভলভারটা আনতে পারতেন। কিন্তু আনলেন না। নিজের একটা ক্রাচ সন্তুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এটা ধর, সন্তু। লোকটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দে।

সন্তু চট করে একটু ঘুরেই লুফে নিল ক্রাচটা। তারপর সেটা বনবন করে ঘোরাতে লাগল।

কতার সিং একটা ন ইঞ্চি ছুরি নিয়ে অত বড় ক্রাচের সঙ্গে কী করে লড়বে? সে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সন্তু দমাস দমাস করে মারতে লাগল তার পিঠে, বুকে।

আমিনা কান্না ভুলে গিয়ে খলখল করে হাসতে লাগল তা দেখে।

দুবার কতার সিং ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর উঠেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। সন্তু তাড়া করে গেল তাকে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, মার, আরও মার দে, সন্তু। ওর এত সাহস, সকালবেলাতেই ছুরি বার করে এত লোকের সামনে?

কতার সিং কোনওক্রমে উঠে পড়ল জিপগাড়িতে। দুর্বোধ ভাষায় কী যেন শাসাল মুখ বার করে। তারপর হুস করে বেরিয়ে গেল জিপটা।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু তার কাঁধ চাপড়ে বললেন, বাঃ, ভাল লড়েছিস, সন্তু। বেশ করেছিস ওকে মেরেছিস।

নুরুলসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনার ওইটুকু মেয়েকে মারল, আপনি নিজে কিছু বললেন না?

নুরুলসাহেব বললেন, আমাকে এখানে চাকরি করতে হয়। পুলিশ পর্যন্ত ওঁদের ভয় পায়। এই যে কাণ্ডটা ঘটল, এর পর কী হয় কে জানে!

কাকাবাবু বললেন, এত ভয়ে-ভয়ে চাকরি করতে হবে? এর চেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে থাকাও ভাল। মানুষের আত্মসম্মান না থাকলে আর কী। রইল?

জোজো বলল, ওই লোকটা নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে ফিরে আসবে।

কাকাবাবু বললেন, আসুক। দেখি ওদের মুরোদ। ঠাকুর সিং টের পেয়ে গেছে, আমি কে! তোরা এক কাজ কর তো জোজো। তুই আর সন্তু ওই যে চেকপোস্টটা আছে, তার

কাছে চলে যা। ওখান দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। ঠা র সিং-এর গাড়ি কিংবা লোকজনেরাও যাবে নিশ্চয়ই। তোরা ওখানে অন্য লোকজনদের শুনিয়ে-শুনিয়ে গল্প কর যে কতার সিংকে কেমন মেরেছিস! সবাইকে বুঝিয়ে দে যে আমরা ভয় পাই না।

সন্তু আর জোজো মজা পেয়ে গেল। মহিমও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। ওরা তিনজনে সেই চেকপোস্টের কাছে একটা কালভার্টে গিয়ে বসল।

একটা গাড়ি থামতেই জোজো হাসতে হাসতে বলল, ওই যে কর্তার সিং না কে একটা লোক এসেছিল, ঠাকুরুসিং-এর বাঁ হাত...

মহিম বলল, বাঁ হাত না, ডান হাত!

জোজো বলল, ডান হাত না ডান পা কে জানে! দেখতেই তাগড়া চেহারা, আসলে একটা ভা! একখানা ঘুসিতে কুপোকাত!

মহিম বলল, মটিতে পড়ে গিয়েই চ্যাঁচাতে লাগল, ঠাকুর সিং, বাঁচাও, বাঁচাও! কোথায় ঠাকুর সিং! সেও তো একটা মহাভিতু!

জোজো বলল, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নামে সিনেমাটায় একটা গান ছিল জানিস!

তারপর সে গেয়ে উঠল, ভজন পূজন জানি না, মা, জেতেতে ফিরিঙ্গি...

থেমে গিয়ে বলল, এ গানটা না, আর-একটা গান আছে ঠাকুর সিং সম্পর্কে :

হয়ে ঠাকুর সিংয়ের বাপের জামাই
কোর্তা-টুপি ছেড়েছি।

মহিম হাসতেহাসতে বলল, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এই ঠাকুর সিংয়ের কথা কী করে জানল?

জোজো বলল, ঠাকুর সিং নাকি খুব বীরপুরুষ। তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক যাত্রাদলের সেনাপতির মতন। কাকাবাবু মাত্র পাঁচ মিনিট লড়ে ওর হাত থেকে তলোয়ারটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর থেকে আর ঠাকুর সিং কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকাতেই সাহস পায়নি, লক্ষ করেছিলি?

সন্তু বলল, ঠাকুর সিংয়ের তো প্রাণ বেঁচে গেল কাকাবাবুর দয়ায়।

জোজো বলল, ভারী তো বীর! বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা!

তিনজনে হোহো করে হেসে উঠল একসঙ্গে।

একটা গাড়ি থেমে চেকপোস্টে নম্বর লেখাচ্ছিল। দুজন লোক ওদের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল। একজন হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কার কথা বলছেন? কোন ঠাকুর সিং?

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, এই তো এখানকার ঠাকুর সিং। যার বাড়ির নাম রূপ মঞ্জিল। আমাদের কাকাবাবুর সঙ্গে লড়তে এসেছিল, হেরে ভূত হয়ে গেছে।

লোকটি বলল, কাকাবাবু কে?

জোজো উত্তর দিল, রাজা রায়চৌধুরী! তাঁর নাম শুনলেই ঠাকুর সিং এখন ভয়ে কাঁপে।

মহিম বলল, আর এই যে ছেলেটি সন্তু, এ ঠাকুর সিংয়ের চ্যালা কতার সিংয়ের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে এক ঘুসিতে।

জোজো বলল, সকালবেলা বেয়াদপি করতে এসেছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপর যারা অত্যাচার করে, তাদের আমরা দারুণ শাস্তি দিই।

লোক দুটি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। এরকম কথা যেন তারা জীবনে শোনোনি।

এইরকম চলল বেশ কিছুক্ষণ। অনেক গাড়ির লোক এইসব কথা শুনে গেল। তাদের মুখে-মুখে আবার ছড়িয়ে গেল অনেক দূর।

চেকপোস্টে যে-লোকটি নম্বর লেখে সে এক সময় উঠে এসে বলল, এই, তোমরা এইসব কথা বোলো না। ঠাকুর সিং সাঙ্ঘাতিক লোক!

সন্তু বলল, আমরা তো মিথ্যে কথা কিছু বলছি না। যা সত্যি তাই বলছি।

জোজো বলল, ঠাকুর সিংয়ের বাড়িটা নাকি সিংহের গুহা ও বাংলায় একটা ছড়া আছে জানেন? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস/ পঞ্চাশটা বাঘ আমার। এক-এক গ্রাস!

একটু পরে বাংলো থেকে একজন লোক এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আজ দুপুরটা সবাই ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। রাত্তিরে আজ বেরোব। সারা রাত জাগতে হতে পারে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে কোথায় যাব, কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন, সেটা রাত্তিরেই ঠিক করব!

পাশাপাশি বিছানায় শুয়েও সন্তু-জোজোর ঘুম এল না অনেকক্ষণ। গল্পই চলতে লাগল। কাকাবাবু কিন্তু দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোলেন। যেন তাঁর কোনও চিন্তাই নেই।

বিকেলে উঠে তিনি চা খেলেন দুবার।

সন্ধে-সন্ধের সময় ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, আমাদের চারটে খাবারের প্যাকেট করে দিন। রাত্তিরে এখানে খাব না। জঙ্গলে যাব, জঙ্গলে বসে। খাব। আর আপনার এখান থেকে দু-একটা বালিশ-পাশবালিশ আর চাদর নিয়ে যাচ্ছি।

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, জঙ্গলে বালিশ-চাদর নিয়ে কী করবেন?

কাকাবাবু বললেন, ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে একটুখানি শুয়ে নেব। জঙ্গলে শুয়ে থাকতে ভারী আরাম লাগে।

তারপর কাকাবাবু বাংলোর মালি, বেয়ারা, দরোয়ান প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, এখন জঙ্গলে কী কী জন্তু জানোয়ার আছে, কোথায় গেলে কোন্টা দেখা যায়। যেন তিনি সকলকে জানাতে চান যে, তিনি আজ সদলবলে জঙ্গল ঘুরতে যাচ্ছেন।

আটটার সময় বাকি তিনজনকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বললেন, তৈরি হয়ে নাও, এবার বেরোব।

মহিমকে বললেন, কাল তুমি যেন কী কী অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলে ঠাকুর সিংয়ের লোকদের ঘায়েল করতে? ঘুমের ওষুধ, ক্লোরোফর্ম! নিয়ে নাও সঙ্গে, আজ কাজে লেগে যেতে পারে।

সবাই গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, ডান দিকে দু কিলোমিটার গেলে একটা সল্ট লিক আছে না? পাশে একটা পুকুর? সেইদিকে যাচ্ছি।

চেকপোস্টের কাছে এসে সেখানকার লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সল্ট লিক আছে কোন্ দিকে? ওখানে কি একটা পুকুর আছে? জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্য ওইটাই তো ভাল জায়গা, তাই না?

কাকাবাবু যেভাবে সবাইকে জঙ্গলে যাওয়ার কথা বলছেন, তাতে সন্তু আর জোজো দুজনেরই ধারণা হল, কাকাবাবু আসলে জঙ্গলে যাবেন না। ঠাকুর সিংয়ের বাড়ির দিকেই গোপনে যাবেন।

মহিম সেইদিকেই গাড়ি চালাচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, উই, ডান দিকে ঘোরো।

গাড়ি ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। খানিক বাদে কাকাবাবু এক জায়গায় থামতে বললেন, সেখানে সত্যিই একটা পুকুর রয়েছে।

টর্চের আলো ফেলে-ফেলে কাকাবাবু আগে জায়গাটা পরীক্ষা করলেন ভাল করে। পুকুরের একদিকে একটা ভাঙা ঘাট, অনেক কাল আগে তৈরি হয়েছিল, বেশ চওড়া। সেই ঘাটের দুপাশে বড় বড় আমগাছ। একটু ফাঁকা জায়গায় একটা পাথর বসানো। এর মধ্যে নুন থাকে, জন্তু-জানোয়াররা এসে সেই নুন চাটে।

সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে কাকাবাবু অন্যদের ডেকে বললেন, শোনো, আমি একটা প্ল্যান করেছি। এখানে একটা ফাঁদ পাতব। আজ যা কাণ্ড ঘটেছে, তাতে ঠাকুর সিং তার দলবল নিয়ে আমাদের খুঁজতে আসবেই। প্রথমে যাবে বাংলোতে, সেখানে না পেয়ে খবর শুনে ঢুকবে এই জঙ্গলে। ওকে ওর বাড়ির বাইরেই পেতে চাই, না হলে জব্দ করা যাবে না। আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। সন্তু আর জোজো থাকবে গাছের ওপর। মহিম শুয়ে থাকবে গাড়ির তলায়। মোটর মিস্তিরিরা যেমন তলায় শুয়ে থাকে, সেইভাবে। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, ওরা কজন আসে। দুজন কিংবা তিনজন পর্যন্ত হলে ঠিক আছে। বেশি যদি হয়। দশ বারোজনের দল হলে আমরা কিছুই করতে পারব না। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাবে। যদি সেরকম বড় দল দেখি, আমরা কোনও সাড়াশব্দ করব না। গাড়ির হেডলাইট জ্বালা থাকবে, ওরা দেখবে ফাঁকা গাড়ি। তখন নিশ্চয়ই ভাববে যে, আমরা পাড়ি এখানে রেখে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে গেছি। ওরা সেদিকে খুঁজতে গেলেই আমরা সুযোগ বুঝে গাড়িতে চেপে পালাব।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আর যদি দু-তিনজন আসে?

কাকাবাবু বললেন, তা হলে আমি ধরব ঠাকুর সিংকে। তাকে নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না। বাকি লোক দুটোকে ধরবে সন্তু আর জোজো। আর মহিম, তুমি তোমার ক্লোরোফর্মের শিশিটা কাজে লাগিও, চটপট সবাইকে অজ্ঞান করে ফেলবে। আমরা তো আর মানুষ খুন করব না, অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাব!

পর পর তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, কিন্তু মনে রেখো, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাবধানতা আর লুকিয়ে থাকা। ওরা যেন কোনওক্রমেই প্রথমে আমাদের দেখতে না পায়। আর যদি বড় দল আসে, তা হলে আমাদের পালাতে হবে। কোনওরকম হঠকারিতার পরিচয় দিলে চলবে না। আর একটা কথা, আমি যখন বলব, এইবার। ঠিক তখনই তোমরা অ্যাকশন শুরু করবে। তার আগে আমি যাই বলি, এমনকী তোমাদের নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেবে না। পালাবার দরকার হলেও আমি বলব, এইবার!

মহিম জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সার, গাড়ির তলায় শুয়ে থাকার চেয়ে আমি গাড়ির ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারি না?

কাকাবাবু বললেন, ওরা এসে গাড়ির ভেতরটা খুঁজে দেখবেই। তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে। গাড়ির তলায় সাধারণত কেউ খুঁজে দেখে না।

মহিম বলল, তা হলে আমিও কোনও গাছের ওপর লুকিয়ে থাকব। গাড়ির তলায় শুতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে তাই-ই থাকো। কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে, নট নড়নচড়ন হয়ে থাকার দরকার নেই। একটু নড়াচড়া করতে পারো। ওরা জানান দিয়েই আসবে। তবে কথা বলার দরকার নেই। যে-যার খাবার গাছের ওপর বসেই খেতে পারো, কিংবা আগেই খেয়ে নিতে পারো। তোমরা উঠে পড়ো গাছে, আমি আমার কাজ শুরু করি।

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, তুই গাছে উঠতে পারিস তো?

জোজো বলল, ইজি। আফ্রিকায় আমি বহুবার গাছে উঠেছি, এক-একটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু।

সন্তু বলল, তা হলে ওঠ তুই আগে।

জোজো বলল, প্রথমটায় তুই একটু ঠেলে দে!

একটা ঝাঁকড়া মতন আমগাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরল জোজো। সন্তু ঠেলে দিল পেছন থেকে। জোজো ঘঁচোড়-প্যাচোড় করে খানিকটা উঠে গিয়ে পড়ে গেল ধপাস করে। গাছটা পুকুরের দিকে একটু বাঁকা। জোজো পড়ে গিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে গড়াতে লাগল জলের দিকে।

জোজো প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে, ধর, ধর আমাকে, ডুবে য়ার, ডুবে যাব।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, ডুবে যাবি মানে?তুই সাঁতার জানিস না? তুই যে বলেছিলি, তুই ভূমধ্যসাগরে সাঁতার কেটেছিস?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, সে তো দিনের বেলায়। রাত্তিরবেলা আমি সাঁতার কাটি না।

তারপর আবার গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই তো। একটু ভাল করে ধর আমাকে।

এবার জোজো কোনওরকমে উঠে ওপরের একটা ডালে গিয়ে বসল।

সন্তু তরতর করে উঠে গেল তার পাশের গাছে।

জোজো বলল, তোর তো বেশ প্র্যাকটিস আছে দেখছি। রোজ গাছে চাপিস বুঝি?

সন্তু বলল, রোজ গাছে চাপব, আমি কি বানর নাকি?

জোজো বলল, তুই নিজেই তো সেটা প্রমাণ করলি!

কাকাবাবু বললেন, উহুঁ! আর কথা নয়। শোনো, দু-একটা জন্তু-জানোয়ার জল খেতে কিংবা নুন খেতে আসতে পারে, তখনও কথা বোলো না, কোনও শব্দ কোরো না।

মহিমও স্বচ্ছন্দেই উঠে পড়ল আর-একটা গাছে।

কাকাবাবু কাজে বসলেন। তোশক, বালিশ, চাদর মুড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে চটপট একটা মানুষের মতন আকৃতি বানিয়ে ফেললেন। সেটার গায়ে পরিয়ে দিলেন নিজের একটা জামা। সেটাকে বসিয়ে দিলেন ঘাটের একপাশে। একটু দূর থেকে দেখে মনে হবে, একজন মানুষ যেন ঘাটে বসে পুকুরের শোভা দেখছে। পুকুরের মাঝখানে রয়েছে একরাশ শালুক আর পদ্মফুল।

ঘাটের অন্য ধার থেকে নীচে নেমে একটা ঝোপের মধ্যে বসে রইলেন কাকাবাবু।

এর পর শুধু অপেক্ষা।

গাড়ির হেডলাইট দুটো জ্বলছে। সেদিকে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের খানিকটা। অন্যদিকও পুরোপুরি অন্ধকার নয়। আকাশ সামান্য মেঘলা, তবু জ্যোৎস্না। আছে। এদিক-ওদিক উড়ছে অসংখ্য জোনাকি। যেগুলো নিচুর দিকে, সেগুলোকে মনে হয় কোনও জন্তুর চোখ। কিংবা সত্যিই কোনও-কোনও ছোটখাটো জন্তু ঘুরছে, তাদের চোখ দেখে মনে হচ্ছে জোনাকি।

একটু বাদে গাছ থেকে ফল পড়ার মতন দুটো শব্দ হল। জোজো আর সন্তুর খাবারের ঠোঙা। কাকাবাবু নিজের খাবারটাও খেয়ে নিলেন। এর পর আর খাওয়া যাবে কি না কে জানে! স্যান্ডুইচ আর মুরগি ভাজা। ফ্লাস্কে চা কিংবা কফি আনলে হত। আগে এ কথাটা মনে পড়েনি!

ঘণ্টাখানেক বাদে জঙ্গলের মধ্যে খচমচ শব্দ হল। কেউ যেন সাবধানে হাঁটছে। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকে এল না। হঠাৎ তড়বড়-তড়বড় করে ছুটে এল

তিনটে হরিণ। ঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। জলে নামল না, গাড়িটার দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

এর পর এল দুটো শুয়োর। তারা গাড়িটা গ্রাহ্য করল না, এসেই জল খাওয়া। শুরু করে দিল। একটা শুয়োর ফিরল কাকাবাবুর দিকে। নাকটা উঁচু করে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল। কী যেন বুঝে সে কয়েকটা লাফ মেরে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। অন্যটাও গেল তার পিছু পিছু।

কাকাবাবু ভাবলেন, এও তবু ভাল। হরিণ, শুয়োর ঠিক আছে। আজ একটা বাঘ এসে পড়লেই মুশকিল। বাঘ ঠিক মানুষের গন্ধ পেয়ে যাবে। মানুষ দিয়ে যদি ডিনার সারতে চায়? রিভলভার দিয়ে তো বাঘ মারা যাবে না। ভয় দেখানো যেতে পারে। কিন্তু তা হলেই ভেস্তে যাবে সব প্ল্যান।

খুব কাছেই কাকাবাবু একটা সস্সর শব্দ পেলেন। বেশ বড় একটা সাপ। কাকাবাবু নিশ্বাস বন্ধ করে অসাড় হয়ে গেলেন। তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে সাপ। চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। নড়াচড়া না করলে সাপ কামড়াবে না।

সাপটা কামড়াল না বটে, কিন্তু সেখান থেকে যেতে যেন প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে দিল।

অসহ্য উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষা।

কাকাবাবুর ঘড়ি অন্ধকারে জ্বলে। তিনি দেখলেন রাত সাড়ে এগারোটা। এভাবে থাকা খুবই কষ্টকর। সন্তু-জোজোরা গাছের ওপর ঘুমিয়ে পড়লে ধপাস করে পড়ে যাবে নীচে। কাকাবাবু ঠিক করলেন আর এক ঘণ্টা দেখে ফিরে যাবেন। ঠাকুর সিং যদি সত্যি ভয় পেয়ে থাকে, তা হলে তাড়া করে আসবে না।

মিনিট পনেরো বাদে পাওয়া গেল জিপের আওয়াজ। এদিকেই আসছে।

কাকাবাবুদের গাড়িটা থেকে খানিকটা দূরে থামল জিপটা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর তোক নামতে লাগল। দুজন। রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িটার ভেতরে, চারপাশে উঁকিঝুঁকি দিল।

কাকাবাবু ধরে নিলেন, জিপে একজন ড্রাইভার থাকতে পারে। তা হলে মোট তিনজন। ঠিক আছে। ওদের মধ্যে ঠাকুর সিংকে চেনা যাচ্ছে।

গাড়িটা ছেড়ে যখন ওরা ঘাটের কাছাকাছি এসেছে, তখন কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, সন্তু, জোজো, কোথায় গেলি! এবার ফিরে আয়!

সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাকুর সিং রাইফেল তুলে গুলি চালাল দুবার।

কাকাবাবু আঃ বলে তীব্র, কাতর আর্তনাদ করলেন।

ঠাকুর সিং বলল, খতম!

গর্বের সঙ্গে সে রাইফেলের নলে দুবার ফুঁ দিল।

সঙ্গের লোকটা জিজ্ঞেস করল, লাশটা ওখানেই ফেলে রেখে যাব?

ঠাকুর সিং প্রথমে বলল, এখানে টেনে নিয়ে আয়।

পরের মুহূর্তে মত বদলে ফেলে বলল, না থাক। ওখানেই থাক। লাথি মেরে পানিতে ফেলে দে।

লোকটি বলল, সেই ছোকরা দুটো গেল কোথায়?

ঠাকুর সিং বলল, আসবে। গুলির শব্দ শুনেছে, এবার আসবে!

লোকটি নিজের গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য আর একটা গুলি চালাল বালিশের মূর্তিটার ওপর। তারপর রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে এগিয়ে এল ঘাটের দিকে লাশে লাথি মারার জন্য।

কাকাবাবু চিৎকার করলেন, এইবার!

ঠাকুর সিং চকিতে রাইফেল তুলে পাশ ফিরতেই তার কপালে ঠেকল রিভলভারের নল। একটা বজ্রকঠিন স্বর শোনা গেল, রাইফেলটা ফেলে দাও। না হলে তোমার মাথায় যেটুকু ঘিলু আছে, তা এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে!

গাছ থেকে ততক্ষণে ঝপাঝপ করে লাফিয়ে পড়েছে সন্তু, জোজো, মহিম।

অন্য লোকটা কতার সিং। সে আর রাইফেল নামাবার সময় পায়নি। সন্তু লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। জোজো এসে তাকে জাপটে ধরল।

মহিম একটা রুমালে জবজবে করে ক্লোরোফর্ম ভিজিয়ে নিল। উত্তেজনার চোটে ছুটে এসে এত জোর ধাক্কা দিল ঠাকুর সিংকে যে, সে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মহিম প্রায় তার বুকের ওপর চেপে বসে নাকের কাছে রুমালটা ঠেসে ধরল।

ঠাকুর সিং খানিকটা লড়বার চেষ্টা করেও পারল না। কাকাবাবু তাকে ভয় দেখাবার জন্য পায়ের কাছে একটা গুলি করলেন। ক্লোরোফর্মের ঘোরে একটুক্ষণের মধ্যেই সে নেতিয়ে পড়ল।

কর্তার সিংয়ের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে সন্তু আর জোজো।

কাকাবাবু সেদিকে তাকালেন না। তিনি রিভলভারটা উঁচিয়ে রইলেন জিপটার দিকে।

কিন্তু সেখান থেকে কেউ নামলও না, গুলিও ছুটে এল না। এই দুজনেরই একজন জিপ চালিয়ে এসেছে? ভেবেছিল, দু খানা রাইফেলের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

মহিম এবার সন্তু আর জোজোর পাশে গিয়ে কর্তার সিংকেও অজ্ঞান করে ফেলল।

কাকাবাবু তবু জিপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা ক্রাচ রেখে, শুধু একটাই ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন, অন্য হাতে উদ্যত রিভলভার।

জিপের চালকের আসনে বসে আছে একজন লোক। স্থিরভাবে চেয়ে আছে। ভয়ে তার মুখখানা ময়লা কাপড়ের মতন হয়ে গেছে। সে ভেবেছে, রাইফেলের গুলি খেয়েও কাকাবাবু মরেননি।

সেই লোকটির কাছে বন্দুক-পিস্তল নেই, রয়েছে একটা রামদা, কিন্তু ভয়ের চোটে সেটাও সে তুলতে পারছে না।

কাকাবাবু আদেশ করলেন, নেমে এসো?

লোকটি অমনই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, মহিম, এদিকে এসো তো। এই লোকটাকেও অজ্ঞান করে দাও।

লোকটি ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল, হাতজোড় করে বলল, আমি কিছু করিনি, আমাকে মারবেন না। আমি কোনও দোষ করিনি।

কাঁদতে কাঁদতে সে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

মহিম দৌড়ে এল এদিকে। ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমালটা চেপে ধরল এর নাকে। লোকটি বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করল না। ঢুলে পড়ল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ! তেমন কিছু ঝাট হয়নি। ফাঁদটা ভালই পাতা হয়েছিল, কী বলো?

জোজো বলল, সত্যি যদি আপনি ঘাটটায় বসে থাকতেন, তাহলে ঠাকুর সিং-পেছন থেকেই আপনাকে গুলি করত?

কাকাবাবু বললেন, ওরা তো সত্যি ভেবেই গুলি চালিয়েছে!

জোজো বলল, আমার ইচ্ছে করছে, ঠাকুর সিংয়ের মাথাটা নারকোলের মতন ফাটিয়ে দিতে।

কাকাবাবু বললেন, না, ঠাকুর সিংকে আমাদের দরকার। ওকে বেঁধে আমাদের গাড়িতে তোলো। আর বাকি দুজনের কী হবে? এত লোকের তো জায়গা হবে না গাড়িতে।

মহিম বলল, ওরা এখানেই পড়ে থাক। যা ডোজ দিয়েছি, তিন-চার ঘণ্টার আগে জাগবে না।

কাকাবাবু বললেন, মাটিতে পড়ে থাকলে কোনও বুনো জানোয়ার কামড়ে দিতে পারে। ওদের জিপগাড়িটায় তুলে দাও।

সন্তুরা তিনজন সেইরকম ব্যবস্থা করে ফেলল।

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বললেন, এবার চলো ডালটনগঞ্জ!

৭. ডালটনগঞ্জের সার্কিট হাউস

ডালটনগঞ্জের সার্কিট হাউসে এত রাতেও অপেক্ষা করছেন নরেন্দ্র ভামা, এই জেলার এস. পি, ডি, এম, আরও কয়েকজন অফিসার। কাকাবাবুদের গাড়িটা থামতেই সবাই ব্যর্থ হয়ে বেরিয়ে এলেন।

কাকাবাবু দরজা খুলে বললেন, নাও নরেন্দ্র, তোমার জন্য ভাল উপহার এনেছি।

নরেন্দ্র ভার্মা ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন, এ কী? এ তো ঠাকুর সিং! সাইমন বুবুম্বা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, হবে, হবে, সব ব্যবস্থা হবে! আগে একে নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করো।

এস. পি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা মরে গেছে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, না, ঘুমোচ্ছে!

এস. পি দারুণ অবাক হয়ে বললেন, ঘুমোচ্ছে? অমন একটা দুর্দান্ত লোককে ঘুম পাড়ালেন কী করে?

কাকাবাবু বললেন, সেসব গল্প পরে হবে। এখন অনেক কাজ আছে।

ঠাকুর সিংকে ধরাধরি করে একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবুরা বসলেন পাশের ঘরে। কাকাবাবু সবাঙ্গ চুলকাচ্ছেন। যে ঝোপের মধ্যে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, সেখানে একটা পিঁপড়ের বাসা ছিল। সারা গায়ে পিঁপড়ে ছড়িয়ে গেছে। এতটুকু-টুকু পিঁপড়ের কামড়ে কী জ্বালা!

সেই অবস্থাতেই কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র, দু গাড়ি পুলিশ পাঠাও রূপ মঞ্জিলে। সাইমন বুবুম্বা সেখানে আছে। ঠাকুর সিং উপস্থিত থাকলে সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করা মুশকিল ছিল। চট করে কোথাও সরিয়ে দিত। কিংবা ঠাকুর সিং ওকে মেরে ফেলত। সেইজন্যই টোপ দিয়ে ঠাকুর সিংকে বাইরে আনতে হল। ওর চ্যালারা বিশেষ বাধা দিতে পারবে না। ঠাকুর সিংয়ের হুকুম ছাড়া সাইমনকে মেরেও ফেলতে পারবে না!

ডি, এম বললেন, ঠাকুর সিংয়ের মতন একটা দুর্দান্ত ক্যারেকটারকে ঘুম পাড়িয়ে, বেঁধে নিয়ে এলেন, এটা এখনও যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, চোখের সামনে দেখতে তো পাচ্ছেন। পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আর দেরি করবেন না। আমি নিজেও সঙ্গে যেতাম, কিন্তু পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে গেছি। এক্ষুনি আমাকে স্নান করতে হবে! আপনারাই যান।

এস. পি আর ডি. এম দুজনেই চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে।

কাকাবাবু বাথরুমে ঢোকার আগে বললেন, সন্তু, জোজো, মহিম, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও বরং। ওদের ফিরে আসতে তো সময় লাগবে! তোমাদেরও অনেক ধকল গেছে। দ্যাখো, এখানে অনেক ঘর আছে!

প্রায় আধঘণ্টা বাদে কাকাবাবু স্নান করে, সুস্থ হয়ে বেরোলেন।

সেই ঘরে নরেন্দ্র ভামা একা বসে আছেন একটা ইজি চেয়ারে। কাকাবাবু খাটের ওপর খানিকটা হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন।

তারপর বললেন, উঃ, পিঁপড়ের কামড়ে সারা গা ফুলে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে একটা বিষাক্ত সাপ চলে গেল, ঠাকুর সিং রাইফেলের গুলি ছুড়ল, সে সবেও কিছু হয়নি, কিন্তু কাবু করে দিল এই পিঁপড়েগুলো।

নরেন্দ্র ভার্মা শুকনো গলায় বললেন, রাজা, আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সাইমন বুবুম্বাকে উদ্ধার করা যাবে তো?

কাকাবাবু বললেন, কাল সকালেই ওকে আমরা দেখে এসেছি। এর মধ্যে মেরে ফেলার কথা নয়। সাতদিনের সময়সীমা তো পেরোয়নি?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তুমি দেখে এসেছ, তারপর প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। এর মধ্যে কত কী হতে পারে। আমার ভয় হচ্ছে কী জানো? সাইমন বুবুম্বা বেশ দুঃসাহসী মানুষ, খেলাধুলোয় ওস্তাদ ছিল ছাত্র বয়েসে। সে নিজে যদি পালাবার চেষ্টা করে? এরা তো সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করে দেবে! অসমে একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানীকে আতঙ্কবাদীরা বন্দি করে রেখেছিল। কাল রাতে তাঁর ডেড বডি পাওয়া গেছে। তিনি পালাতে গিয়ে মরেছেন। আমাদের সরকার খুব চিন্তিত। মুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাইয়ের খবর জানতে চেয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। সাইমনকে উদ্ধার করতে না পারলে দু দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, তা হলে আমরা শস্তায় পেট্রোল পাব না। আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে!

কাকাবাবু বললেন, ফাইলে পড়লাম, সাইমন ছাত্র বয়েসে পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলো বেশি করেছে। ইংল্যান্ডে দুবার মারামারিও করেছিল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হ্যাঁ, মানুষটা খুব তেজী। সাহেবদের দেশে কেউ ওকে কালো লোক বলে ঠাট্টা করলেই তাকে মেরে বসত! এখন অবশ্য প্রেসিডেন্টের দূত হিসেবে সব দেশে যায়, সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, আরও একটা জিনিস দেখলাম। বছর দু-এক আগে টার্কিতেও সাইমনকে একটা দল গুম করেছিল। সে-দেশের সরকারের কাছ থেকে দু কোটি ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছিল তারা। সে-দেশের সরকার টাকা। দিয়েই ছাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। লোকটা খুব বেশি দামি দেখা যাচ্ছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, দামি তো বটেই! মুরুন্ডি দেশটা ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পেট্রোল আছে প্রচুর। তাই অনেক দেশই ওই ছোট্ট দেশকে খাতির করে। ওইসব দেশের আতঙ্কবাদীরাও জানে যে সাইমনকে ধরে রাখতে পারলে সরকার কেঁপে যাবে। টাকা দিতে বাধ্য হবে। টার্কিতে কী হয়েছিল জানো? আমাদের মতন ওসব দেশের কাগজে তো সব কিছু বেরোয় না। টার্কির সরকার ওকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। শেষপর্যন্ত সরকার বিপ্লবী দলকে দু কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয়ে সাইমনকে ছাড়িয়ে নেয়। ওদের সরকার সেটা স্বীকার করেনি। কিন্তু আমাদের ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট আছে।

কাকাবাবু বললেন, ওসব দেশ টাকা দিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ গরিব দেশ, এত টাকা দেবে কী করে? এক কোটি ডলার! অনেক টাকা!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ বিশেষ ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়েই। সাতদিনের মধ্যে আমরা কিছু করতে না পারলে বোধ হয় আমাদের সরকারও টাকাটা দিয়েই দেবে। সাইমন বুবুম্বার প্রাণের ঝুঁকি কিছুতেই নেওয়া যায় না।

হঠাৎ নরেন্দ্র ভার্মা ঝুঁকে কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, রাজা, আজ যদি সাইমনকে উদ্ধার করা যায়, তা হলে তুমি শুধু যে আমার মুখরক্ষা করলে তাই-ই না, আমাদের দেশেরও মহা-উপকার করলে। তোমার মতন দুঃসাহসী মানুষ ছাড়া কেউ এটা পারত না।

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে, তুমিই তো আমাকে ঠাকুর সিংয়ের কাছে পাঠালে। তোমারই তো কৃতিত্ব! আমি আর কী করেছি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তুমি ঠাকুর সিংকে ঘুম পাড়িয়ে ধরে আনলে কী করে, সেটা বলো!

কাকাবাবু বললেন, তাও আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। সন্তু আর জোজোই যা কিছু করেছে। আর তুমি যে পুলিশের লোকটিকে ড্রাইভার করে পাঠিয়েছ, সেই মহিমেরও খুব সাহস আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তবু তুমি সবটা বলো। যতক্ষণ না ফিরে আসে ওরা-

কাকাবাবু জঙ্গলের মধ্যে ফাঁদ পাতার ঘটনাটা সব বুঝিয়ে দিলেন!

শোনার পর নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তাই তো, তুমি কিছুই করোনি! ওরা রইল গাছে, তুমি রইলে মাটিতে। তুমি যখন চেঁচিয়ে উঠলে, তখন যদি ওরা ঝোপের মধ্যে গুলি করত? তোমার পায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেল, সারা গায়ে বিষ-পিঁপড়ে, তবু তুমি নড়লে না, খোঁড়া পা নিয়ে বুকে হেঁটে-হেঁটে ঠাকুর সিংয়ের কাছে এসে তার কপালে রিভলভাল ঠেকালে, এসব তো কিছু না, তাই না? তুমি ছাড়া এরকম ঝুঁকি আর কেউ নিতে পারে, এরকম মানুষ আমি জানি। না। তবে সন্তু-জোজোরাও দারুণ কাজ করেছে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি জানো, নরেন্দ্র, সাইমন খুব জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করে। কলকাতায় একজন জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তাই নাকি? কলকাতায়, কার কাছে?

কাকাবাবু বললেন, আমাদের জোজো, তার বাবার কাছে। উনি বেশ নামকরা জ্যোতিষী শুনেছি। সাইমন ওঁর কাছে গিয়েছিল নিজের দেশের

প্রেসিডেন্ট হতে পারবে কি না কিংবা কবে হবে, সেটা জানতে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হা, ওর খুব প্রেসিডেন্ট হওয়ার শখ। কিন্তু ওর দাদা প্রেসিডেন্ট কেনেথ বুবুম্বা খুব ভাল লোক। সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। সামনের ভোটে তিনিই জিতবেন। যদি না তিনি ভাইয়ের জন্য সরে দাঁড়ান!

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজা, আমি আর টেনশান সহ্য করতে পারছি না। ওরা কখন আসবে? কাল সকালেই আমাকে দিল্লিতে রিপোর্ট করতে হবে! ওরা এত দেরি করছে কেন?

কাকাবাবু বললেন, এমন কিছু দেরি হয়নি। এবার এসে পড়বে। তুমি বরং এককাপ করে কফির ব্যবস্থা করতে পারো? এত রাতে কি এখানে কেউ কফি বানিয়ে দেবে? আমার খুব কফি খেতে ইচ্ছে করছে!

নরেন্দ্র ভার্মা হাঁকডাক করতেই একজন বেয়ারা এসে হাজির হল। তাকে কফির কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, হ্যাঁ সার, হবে।

কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র, বেশি উত্তেজিত হোয়ো না। শান্ত হয়ে বোস। এখানে তো তবু ঘরের মধ্যে বসে আছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। আর খানিক আগে আমরা ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে, একটু নড়াচড়া করার উপায় ছিল না, সেই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুর সিংয়ের জন্য প্রতীক্ষা। প্রত্যেকটা মিনিটকে মনে হচ্ছিল এক মাইল লম্বা।

নরেন্দ্র ভার্মা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, ওফ!

বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল। সবেমাত্র ওঁরা দু-তিন চুমুক দিয়েছেন, এই সময় বাইরে গাড়ির শব্দ হল।

নরেন্দ্র ভার্মা অমনই ছুটে গেলেন। কাকাবাবু ছুটতে পারেন না, তিনি কাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

দুটো গাড়িই ফিরে এসেছে। প্রথমে নামলেন এস. পি সাহেব।

নরেন্দ্র ভামা তাঁর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? পাওয়া গেছে?

এস. পি একগাল হেসে বললেন, অপারেশান সাকসেসফুল!

কাকাবাবু একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সাইমন বুবুম্বাকে পেয়েছেন? নিয়ে এসেছেন?

এস. পি বললেন, হ্যাঁ। খুব সহজেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন। ঠাকুর সিং নেই বলে ওর চ্যালা-চামুণ্ডারা পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেল। কোনও বাধাই দিল না।

অন্য গাড়ি থেকে ডি. এম নামলেন, তাঁর সঙ্গে সাইমন বুবুম্বা। জিন্স আর হলুদ গেঞ্জি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বুকে ঝুলছে একটা ক্রস।

ডি. এম সাহেব খাতির করা গলায় ইংরেজিতে তাকে বললেন, আসুন, মিঃ বুবুম্বা, ভেতরে আসুন। আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে জানি।

সাইমন বুবুম্বা কোনও কথা বললেন না, উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। নরেন্দ্র ভার্মা যে ইজি চেয়ারটায় বসে ছিলেন, সেটাতে বসানো হল তাঁকে।

এস. পি বললেন, আমরা ঠাকুর সিংয়ের রূপ মঞ্জিলে গিয়ে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলাম। তারপর গেট খোলার হুকুম দিতেই গেট খুলে গেল। বাড়িটা সার্চ করতে আধঘণ্টার বেশি লাগেনি। ভেতরে প্রায় পঁয়তিরিশজন লোক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু আমাদের বাধা দেয়নি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, দাঁড়ান, ওইসব ডিটেইলস একটু পরে শুনব।

তিনি সাইমন বুবুম্বার কাছে এসে বললেন, মিঃ বুবুম্বা, আমাদের দেশে এসে আপনার এই যে বিশ্রী ভোগান্তি হল, সেজন্য আমরা খুবই দুঃখিত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। কাল সকালেই আপনাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

সাইমন বুবুম্বা সোজা চেয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

এস. পি বললেন, সার, উনি বোধ হয় খুব মানসিক আঘাত পেয়েছেন, এ-পর্যন্ত একটাও প্রশ্নের উত্তর দেননি।

রাত এখন আড়াইটে। এরকম একজন বিশিষ্ট বিদেশিকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে সার্কিট হাউজের সবাই দেখতে এসেছে। সন্তুরা ছিল একটা অন্য ঘরে, জোজো ঘুমিয়ে পড়লেও সন্তু আর মহিম ঘুমোয়নি। তারাও ছুটে এসেছে এ-ঘরে।

কাকাবাবুর মুখখানা প্রসন্ন। তিনি মহিমকে দেখে বললেন, পুরস্কারটা তোমার কপালেই নাচছিল। আমি রেকমেন্ড করে দেব, পুরস্কারের দশ লাখ টাকা যেন তোমাকেই দেওয়া হয়।

মহিম বলল, সার, আমি আর কী করেছি! সব তো আপনার জন্যই হল। আমি এক লাখ পেলেই খুশি হব।

সন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাইমন বুবুম্বার দিকে। অন্যদের ঠেলাঠেলিতে তাকে পেছন দিকে চলে যেতে হল।

নরেন্দ্র ভার্মা আর অন্য অফিসাররা সাইমন বুবুকে কথা বলাবার চেষ্টা। করছেন, কিন্তু তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি এ-পর্যন্ত।

এবার কাকাবাবু এসে বললেন, মিঃ বুবুম্বা, আপনি কফি খাবেন?

এবারও তিনি উত্তর দিলেন না, এমনকী মাথাও নাড়লেন না।

কাকাবাবু বললেন, থাক, এখন ওসব কথা থাক। এখন ওঁর বিশ্রাম দরকার। ওঁকে শুতে দাও। ঘরের মধ্যে এত ভিড়, ঘর খালি করে দাও!

এস. পি-সাহেব বললেন, সেই ভাল। উনি ঘুমোন। আপনারা কেউ ওঁকে অফিশিয়ালি আইডেন্টিফাই করবেন? আমাকে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, আমি নিজে ওকে দেখিনি, ছবি দেখেছি। রাজা, ছবিগুলো কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, সে ফাইল তো ফরেস্ট বাংলোয় রয়েছে। ছবির সঙ্গে মিল আছে। কাল সকালে জোজো একবার আইডেন্টিফাই করেছিল। সন্তু, একবার জোজোকে ডাক তো।

সন্তু বলল, জোজোকে ডাকবার দরকার নেই। এই লোকটি সাইমন বুবুম্বা নয়!

সবাই সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, অ্যাঁ কী বলছিস তুই, সন্তু?

সন্তু বলল, কোনও আফ্রিকানের কি টিকি থাকে? এর চুলে টিকি আছে!

এস. পি সাহেব প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লোকটির মাথার ওপর।

ভাল করে পরীক্ষা করতেই বোঝা গেল, লোকটির মাথায় যে কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, তা আসলে পরচুলা। তার তলা দিয়ে, ঘাড়ের কাছে। বেরিয়ে পড়েছে একটা বেশ পুরুষ্টু টিকি। ওর ভুরু দুটোও কিছুটা আঁকা।

একটানে পরচুলাটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, লোকটার মাথায় অনেকখানি টাক, বাকি চুলগুলো একটুও কোঁকড়ানো নয়। মোটেই আফ্রিকান নয়, এ এক টিকিওয়ালা বিহারী ব্রাহ্মণ। ছদ্মবেশ ধরলেও টিকিট কাটতে রাজি হয়নি।

এস. পি বললেন, মাই গড! এ যে একটা ইমপস্টার। নকল লোক!

নরেন্দ্র ভার্মা সাজ্ঘাতিক হতাশ হয়ে ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে।

কাকাবাবুর মুখখানা পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেছে।

এস. পি-সাহেব রিভলভার বার করে ধমক দিয়ে বললেন, এই, বোবা সেজে থাকলে তোর খোপড়ি উড়িয়ে দেব, তুই কে? তোর নাম কী বল!

লোকটি এবার হাতজোড় করে বলল, হুজুর, আমার নাম রামশরণ দুবে। আমার কোনও দোষ নেই। ঠাকুরসাহেব আমাকে যেরকম সেজে থাকার হুকুম দিয়েছেন, আমি সেরকম থেকেছি। আমি আরকিছু জানি না!

এস. পি-সাহেব রাগ সামলাতে পারলেন না। ঠাস করে এক চড় কষালেন লোকটার গালে।

নরেন্দ্র ভামা ব্যাকুলভাবে বললেন, কী হবে, রাজা? পাওয়া গেল না! সাইমন বুবুম্বা কোথায় আছে, এখনও আমরা জানি না!

কাকাবাবু বললেন, ঠাকুর সিং নোকটা এত ধড়িবাজ! ভেবেছিলাম ওর বুদ্ধি নেই! ও একটা নকল লোককে সাজিয়ে রেখে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে! আসল লোকটাকে লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোথাও!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, কাল সকালে যখন ঠাকুর সিং আমাদের দেখিয়েছিল সাইমন বুবুম্বাকে, তখনই আমার একটু-একটু সন্দেহ হয়েছিল। অত সহজে দেখাবে কেন?

কাকাবাবু বললেন, আমারও যে সন্দেহ হয়নি তা নয়। তারপর ভেবেছিলাম, লোকটা অত্যন্ত অহঙ্কারী। বোকা আর অহঙ্কারী। অহঙ্কারের চোটে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

এস. পি-সাহেব বললেন, তা হলে দেখলেন তো, ঠাকুর সিংকে আমরা কেন জেলে ভরতে পারি না? ও কোনও প্রমাণ রাখে না। সাইমন বুবুম্বাকে যে ও কিংবা ওর দল গুম করেছে, তা এখনও প্রমাণিত হল না। ও বলবে, একজন

নকল লোককে সাজিয়ে রেখে ও আমাদের সঙ্গে মজা করেছে।

নরেন্দ্র ভামা আবার বললেন, রাজা, তোমার এত পরিশ্রম, সব নষ্ট হয়ে গেল! টাকা না দিলে সাইমনকে ওরা মেরে ফেলবে। টাকা দিতেই হবে। আমরা কিছুই করতে পারলাম না!

কাকাবাবু বললেন, তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন? এখনও তো তিনদিন সময় আছে। একবার যখন এই কাজে নেমে পড়েছি, তখন এর শেষ না দেখে ছাড়ব না! সাইমন বুবুম্বাকে আমি উদ্ধার করবই!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। তিনদিনের মধ্যে কি তা সম্ভব!

কাকাবাবু বললেন, ঠাকুর সিংকে আমি ছাড়ব না। ও যেখানেই লুকিয়ে রেখে থাকুক...

এস. পি-সাহেব বললেন, ঠাকুর সিংকে এখনও আপনার চিনতে বাকি আছে। হাজার জেরা করলেও ওর মুখ থেকে একটা কথা বার করা যায় না। অবশ্য আমরা তবু চেষ্টা করব—

কাকাবাবু বললেন, আপনাদের যা করার করবেন। তার আগে আমি একলা ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। একটা জলের জাগ নিয়ে আয় তো, সন্তু–

কাকাবাবু পাশের ঘরের দরজাটা খুলে আলো জ্বাললেন। ঠাকুর সিং এখনও চোখ বুজে আছে। সন্তুর কাছ থেকে জলের জাগটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, তুই বাইরে থাক।

খাটের কাছে এসে কাকাবাবু ঠাকুর সিংয়ের মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন। বিছানা ভিজে যেতে লাগল, তাতে কাকাবাবু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বেশ কয়েকবার ছিটে দেওয়ার পর বাকি জলটা সবটাই ঢেলে দিলেন ঠাকুর সিংয়ের মুখে।

ঠাকুর সিংয়ের ঘোর অনেকটা কেটে গিয়েছিল এর মধ্যে, তারপর জল লাগায় চোখ পিটপিট করতে লাগল। একসময় পুরো চোখ মেলে কাকাবাবুকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসল, তারপর টের পেল যে তার হাত-পা বাঁধা।

প্রথমে সে যেন কিছুই মনে করতে পারল না।

বেশ কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি... তুমি... রায়চৌধুরী?

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, হাঁ জনাব!

ঠাকুর সিং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ওপর আমি দু দুবার গুলি চালালাম, তবু তুমি বেঁচে আছ?

ওরকম দু-চারটে রাইফেলের গুলি আমি হজম করে ফেলতে পারি!

তুমি জঙ্গল থেকে... একটা জানোয়ারের মতন আমাকে বেঁধে এনেছ?

বেঁধে আনতেই হয়েছে।

অনেক লোক দেখেছে?

এত রাত্রে খুব বেশি লোক দেখেনি। কাল সকালে দেখবে। তোমাকে এখান থেকে এই অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে থানায়!

ঠাকুর সিং মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে কাতরভাবে বলল, হায় ভগবান!

তারপর জ্বলন্ত চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, রায়চৌধুরী, বাংগালিবাবু, তোমাকে দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানো? দুটো ইচ্ছে হচ্ছে। প্রথমটা হল, আমার এই দু হাতে তোমার গলা টিপে মেরে ফেললে আমার মনে শান্তি হবে!

কাকাবাবু জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, না, না, না, না, ওরকম ইচ্ছে মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়। আমাকে গলা টিপে মারা মোটেই সহজ। নয়। আমার গলাটা বেশ শক্ত। আমার হাত দুখানায় বেশ জোর আছে।

আমায় কেউ গলা টিপতে এলে তারও আমি গলা টিপে ধরব যে?

ঠাকুর সিং বলল, আর দ্বিতীয় ইচ্ছেটা হল, তোমার দু পায়ে হাত দিয়ে একবার প্রণাম করি। আমার মাথা তোমার পায়ে ঠেকাই।

কাকাবাবু একটু চমকে গিয়ে বললেন, ওরে বাবা! এ যে উলটো কথা। হঠাৎ এরকম অতিভক্তির কারণটা কী?

রায়চৌধুরী সাব, আমাদের যোদ্ধার বংশ। আমাদের পূর্বপুরুষ সিপাই। মিউটিনির সময় লড়েছে। আমার বাপ-দাদার ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। আমার সামনেও এ-তল্লাটে কেউ উঁচু গলায় কথা বলে না। একমাত্র তুমি আমাকে দু-দুবার জব্দ করেছ! তোমাকে সম্মান করব না? তুমি এক আজব মানুষ!

ওসব কথা থাক। তোমার সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হয়নি, ঠাকুর সিং! সাইমন বুবুম্বাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম, আমার বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

এ আবার কীরকম চ্যালেঞ্জ! একটা নকল লোক সাজিয়ে রেখেছিলে। ওকে দেখিয়ে দিলে, যাতে ওর পেছনে আমরা সময় নষ্ট করি। তোমার বাড়িতে সাইমন বুবুম্বা নেই। যদি থাকত, আর আমি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হতাম, তা হলে চ্যালেঞ্জের একটা মানে হত।

তুমি তাকে খুঁজে পাবে না।

এমন কোন জায়গায় লুকিয়েছ, যাতে খুঁজে পাব না? তোমাকে আমি ছাড়ব না ঠাকুর সিং!

পুলিশকে আমি গ্রাহ্য করি না। পুলিশ আমার কাছ থেকে কোনও কথা বার করতে পারবে না। তুমি একাজ থেকে সরে যাও। তুমি ঝুঁকি কেন নিচ্ছ? টাকার জন্য?

না, টাকার পরোয়া আমি করি না। আমার যা টাকা আছে তাতে আমার বেশ চলে যায়। আমি এ কাজ করছি দেশের জন্য। আমাদের দেশের সম্মান বাঁচাবার জন্য। তুমি দেশটেশ গ্রাহ্য করো না। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে তোমার কী হেনস্থা করি, তুমি কাল সকালে দেখবে। তোমার হাতে দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যাব রাস্তা দিয়ে, সবাইকে বলব, দ্যাখো, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঠাকুর সিংকে আমি জানোয়ারের মতন বেঁধে এনেছি। এই লোকটা টাকার লোভে একজন সম্মানীয় বিদেশি অতিথিকে গুম করেছে, তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। যারা এমন দেশের শত্রুতা করে, তাদের এই শাস্তি। এর মুখে এক ঘা করে জুতো মেরে যাও!

ঠাকুর সিংয়ের গায়ে যেন লোহার ছ্যাকা লেগেছে, সে কাতরে উঠল। ব্যাকুলভাবে মিনতি করে বলল, না, না, ওরকম কোরো না। বরং আমায় গুলি করে মারো।

কাকাবাবু কঠোর স্বরে বললেন, তুমি আমাকে মারার জন্য দুবার ... ইফেলের গুলি ছুড়েছিলে। তার বদলা হিসেবে আমি কাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার দু গালে দুটো জুতো মারবই!

তোমার পায়ে পড়ি, রায়চৌধুরীসাহেব, তুমি এখানেই আমার মাথায় দুটো গুলি ছুঁড়ে দাও! লোকের সামনে আমার অমন বে-ইজ্জত কোরো না। আমার ছেলেমেয়েরা তা হলে আর মুখ দেখাতে পারবে না। আমরা একসময় এখানকার জমিদার ছিলাম। এ-তল্লাটের সব মানুষ আমাদের মানে।

আগে জমিদার ছিলে, এখন টাকার জন্য চুরি-ডাকাতি করো।

না, আমি চুরি-ডাকাতি করি না। ব্যবসা করি। সে ব্যবসা তোমরা বুঝবে। তোমাকে একটা কথা বলি, সাইমন বুবুম্বাকে আমি লুকিয়ে রাখিনি।

তোমার বাড়িতে রাখখানি, অন্য কোথাও রেখেছ।

না। তাও রাখিনি। সে আমার জিম্মায় নেই!

কাল যে বলেছিলে সে তোমার জিম্মায় আছে। সেটা তা হলে ভাঁওতা দিয়েছিলে আমাদের? কোনটা সত্যি, কালকের কথা, না আজকের কথা?

আজকের কথা। রামজির নাম নিয়ে বলছি, ওই আফ্রিকানকে আমার জিম্মায় রাখিনি।

সাইমন বুবুম্বার গুম হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই? তাহলে বাড়িতে একজনকে সাজিয়ে রেখেছিলে কেন?

সম্পর্ক আছে। তা ঠিক?

সম্পর্ক আছে, অথচ তোমার জিম্মায় রাখোনি, এটা কি ধাঁধা, নাকি? তবে কি তোমার চেনা অন্য কারও জিম্মায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ?

ঠাকুর সিং একদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রায়চৌধুরীবাবু, তুমি আমায় তলোয়ার লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছ, তোমার ছোকরা দুটো সে কথা রটিয়ে দিয়েছে। তাতেই আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এর পর লোকে যদি জানে যে, জঙ্গলের মধ্যে তুমি একটা খোঁড়া মানুষ হয়েও আমাকে পেড়ে ফেলেছ, তারপর জানোয়ারের মতন হাত-পা বেঁধে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে এসেছ, তা হলে আর আমার সম্মান কিছুই থাকবে না। তারপর আমার আর বেঁচে থাকারও মানে থাকবে না। আমাদের এদিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে কিংবা জেল খাটলে মান যায় না। কিন্তু কারও কাছে লড়াইয়ে হেরে গেলে সবাই ছি-ছি করে। তুমি যদি এই কথাটা কাউকে না বলল, আমার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দাও, তা হলে তোমাকে একটা গোপন কথা জানাতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, তোমার গোপন কথাটা শুনি, তারপর তোমার শর্ত মানব কি না ভেবে দেখব।

ঠাকুর সিং বলল, কাছে এসো, কানে কানে বলব।

কাকাবাবু বললেন, কানে কানে কেন? এমনই বলল, আমি শুনতে পাব।

ঠাকুর সিং বলল, না, শুধু তোমাকে বলব, দরজার বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে, সব শুনছে। একটু কাছে এসো

কাকাবাবু নাকটা একবার কোঁচকালেন। কারও কানে কানে কথা বলা তিনি পছন্দ করেন না। অনেকের মুখে গন্ধ থাকে।

তা ছাড়া, কাকাবাবু ভাবলেন, লোকটা তাঁর কানটা কামড়ে ধরবে না তো?

অবশ্য লোকটা বেশ নরম হয়ে এসেছে। অপমানের ভয় ওর প্রাণের ভয়ের চেয়েও বেশি।

কাকাবাবু কানটা এগিয়ে দিলেন, ঠাকুর সিং ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

প্রথমে কাকাবাবুর মুখে বিরক্তি ও অস্বস্তির ভাব ছিল। তারপর সেখানে ফুটে উঠল বিস্ময়। তারপর সারা মুখে ছড়িয়ে গেল হাসি।

মাথাটা সরিয়ে এনে কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন।

৮. কাঠমাণ্ডু শহর একেবারে নিঝুম

রাত একটার সময় কাঠমাণ্ডু শহর একেবারে নিঝুম, ঘুমন্ত। অন্যদিন এ-সময়ে, যাও বা দু-চারটে ট্যাক্সি বা দু-চারজন মানুষ দেখা যায়, আজ তাও নেই। কারণ, রাত দশটা থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার।

একটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে একটা হোটেলের গাড়ি কাকাবাবুকে নিউ রোডের একটা কাপড়ের দোকানের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।

দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় আলো আছে বটে, কিন্তু তাও বৃষ্টির জন্য ঝাপসা।

বৃষ্টির জন্যই হঠাৎ এখানে বেশ শীত পড়ে গেছে। কাকাবাবু সুটের ওপর একটা লম্বা রেইন কোট পরে আছেন। তাঁর সঙ্গে দুখানা বেশ বড় চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ দুটিই বেশ ভারী, কারণ গাড়ি থেকে তাঁকে দুবারে দুটো ব্যাগ নামাতে হয়েছে।

কাকাবাবু কাপড়ের দোকানের নামটা একবার পড়লেন, তারপর ঘড়ি দেখলেন।

একটা বেজে গেল, তারপরেও পাঁচ-দশ মিনিট। কেউ এল না। কাকাবাবু ব্যস্ত হলেন না। আমাদের দেশে কজন লোকই বা সময়ানুবর্তী হয়?

আরও পাঁচ মিনিট কাটল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ইউ আর ফ্রম?

কাকাবাবু দেখলেন, যেন মাটি খুঁড়ে দুটো লোক তাঁর দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এরা বাংলা জানে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য কাকাবাবু প্রথমে বললেন, আমি ভারত সরকারের কাছ থেকে এসেছি।

একটু থেমে আবার বললেন, ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, টাকা এনেছেন?

কাকাবাবু বললেন, এই যে দুটি ব্যাগ।

এতে সব টাকা আছে?

হ্যাঁ। সব একশো ডলারের নোট।

আপনাকে তো আমরা এখন ছাড়তে পারব না। সব টাকা গুনে নিয়ে ঠিকঠাক থাকলে তারপর আপনি ছাড়া পাবেন।

আমি তো ছাড়া পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নই। টাকা আপনারা গুনে নেওয়ার পর সাইমন বুবুম্বাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ফিরব।

তাকে তো ছাড়া হবে কাল সকাল সাতটায়।

আমি ততক্ষণই থাকব।

না, সেটা সম্ভব নয়। যাক, চলুন এখন আমাদের সঙ্গে।

লোক দুটিই বেশ লম্বা-চওড়া, ওভারকোট পরা। মাথায় টুপি। একজন কথা বলছে ভাঙা বাংলায়। দন্তের স আর ছ-এর উচ্চারণ অন্যরকম। খুব সম্ভবত অসমের লোক। অন্যজন চুপ করে আছে। একজনের গালে অনেকখানি দাড়ি-গোঁফ, দুজনেরই চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

চামড়ার ব্যাগ দুটো ওই দুজনই তুলে নিল।

একটুখানি এগোবার পর একটা গলি। তার মুখে এসে ওদের একজন বলল, আপনার সঙ্গে আর কেউ নেই? কেউ ফলো করবে না? তা হলে কিন্তু আপনার মরণ নিশ্চিত!

কাকাবাবু বললেন, আমি যতদূর জানি, আমাকে একাই পাঠানো হয়েছে। কেউ কাছাকাছি আছে কি না আপনারাই দেখে নিন।

লোকটি বলল, আমরা পনেরো মিনিট ধরে আপনাকে ওয়াচ করেছি। আর কেউ নেই। ঠিক আছে, তবে আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে কিনা একবার সার্চ করে দেখতে চাই।

কাকাবাবু বললেন, আমার কাছে অস্ত্র থাকবে কেন? আমি তো মোটবাহক মাত্র। বাংলায় যাকে বলে চিনির বলদ। আপনারা একথাটার মানে জানেন কিনা জানি না।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, ওসব বাজে কথা বন্ধ করুন। হাত তুলে দাঁড়ান।

দুটি লোকই কাকাবাবুর সারা গা থাবড়ে পরীক্ষা করল। কিছুই পেল না। কাকাবাবু ইচ্ছে করেই আজ রিভলভারটা সঙ্গে আনেননি।

লোক দুটি বলল, ঠিক আছে।

কাকাবাবু বললেন, হয়ে গেছে তো? আমার শীত লাগছে। বোতামগুলো আটকে নিই।

কাকাবাবুর ব্রেইন কোর্টের বোতামগুলো বড় বড়। তিনি ওপরে গলার কাছের বোতামটা পর্যন্ত আটকে দিলেন।

গলির মধ্যে একটা স্টেশান ওয়াগন দাঁড় করানো। কাকাবাবু তাতে উঠতে যাচ্ছেন, তাঁকে বাধা দিয়ে অন্য লোকটি বলল, আপনার ক্রাচ দুটো, ও দুটোও পরীক্ষা করব। ক্রাচ এনেছেন কেন?

কাকাবাবু বললেন, আমি খোঁড়া মানুষ, ক্রাচ লাগবে না? এ দুটো শুধুই কাচ, এর মধ্যে গুপ্তি-টুপ্তি কিংবা পাইপগান কিছুই নেই।

লোকটি ক্রাচ দুটো নিয়ে উলটে-পালটে-মুচড়ে দেখল। সন্দেহজনক কিছুই পেল না।

এবার গাড়িটা স্টার্ট দিল। একজন নেপালি ড্রাইভার সেটা চালাচ্ছে।

শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা চলল বাইরের দিকে। নেপালে কাকাবাবু অনেকবার এসেছেন, মোটামুটি সব রাস্তাই চেনা। তাঁর মনে হল, গাড়িটা যাচ্ছে। ধূলিখেল-এর দিকে।

কাকাবাবুকে দেখে মনেই হয় না, তাঁর কোনও ভয় কিংবা উদ্বেগ আছে। শান্তভাবে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, আর নিজের বুকে একটা হাত বুলোচ্ছেন।

এক জায়গায় কী কারণে গাড়িটা একটু আস্তে হতেই কাকাবাবু জানলার কাচে মুখ লাগিয়ে বাইরেটা দেখতে গেলেন।

অমনই একজন লোক রুক্ষভাবে তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, ওদিকে কী দেখছেন? চুপটি করে মুখ নিচু করে বসে থাকুন। টাকা পেয়ে গেছি, আপনাকে আমরা মেরে রাস্তায় ফেলে দিতে পারি তা জানেন?

কাকাবাবু বললেন, এমনই-এমনই মারতে ইচ্ছে হয় তো মারুন। সরকারি চাকরি করি। সরকার আমাকে পাঠিয়েছে এই দায়িত্ব দিয়ে, তাই বাধ্য হয়ে এসেছি।

অন্য লোকটি বলল, আগে টাকাগুলো গুনে দেখতে হবে।

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, অনেক টাকার ব্যাপার। গুনতে-গুনতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

দাড়িওয়ালা লোকটি জিজ্ঞেস করল, আপনি সরকারের কী কাজ করেন?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিতান্ত চুনোপুঁটি। বড় বড় অফিসাররা কেউ আসতে রাজি হননি, তাদের প্রাণের দাম অনেক বেশি।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, তা হলে চুপ করে বসে থাকো!

বাকি রাস্তা কেউ কোনও কথা বলল না। কাকাবাবু নিজের বুকে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

গাড়িটা এসে থামল একটা টিলার কাছে। এর পর সিঁড়ি, গাড়ি আর যাবে। টিলার ওপরে একটা বাড়ি।

লোক দুটি তাদের কোটের পকেট থেকে দুটো বিদঘুটে অস্ত্র বার করল। ঠিক রিভলভার নয়, মনে হয় যেন রাইফেলের নল কেটে ছোট করা হয়েছে।

সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তারা চারপাশ দেখল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। চতুর্দিক এমনই শান্ত যেন একটা গাছের পাতা পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। খুব মিহি বৃষ্টিপাতও হচ্ছে নিঃশব্দে।

একজন কাকাবাবুকে বলল, নেমে এসো! কাকাবাবু নেমে এসে খানিকটা আতঙ্কের সঙ্গে বললেন, ওরে বাবা, কতগুলো সিঁড়ি? আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হয়!

লোকটি বলল, তোমাদের গভর্নমেন্ট একটা খোঁড়াকে পাঠাল কেন? আর কোনও লোক পায়নি?

কাকাবাবু বললেন, ছিঃ! কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই। ছোটবেলা কেউ আপনাদের এটা শেখায়নি?

দাড়িওয়ালা লোকটি তার অস্ত্র দিয়ে কাকাবাবুর পিঠে বেশ জোরে একটা খোঁচা মেরে বলল, শাট আপ! তুমি আমাদের জ্ঞান দিচ্ছ? ওঠো!

কাকাবাবু খোঁচা খেয়ে উঃ শব্দ করে বললেন, উঠছি, উঠছি। একটু আস্তে, বেশি জোরে জোরে পারব না!

ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে লোক দুজনের একজন কাকাবাবুর সামনে, একজন পেছনে উঠতে লাগলেন। ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু কয়েক ধাপ উঠে-উঠে হাঁফ নেওয়ার জন্য একটু করে থামতে লাগলেন।

লোক দুটোর আর ধৈর্য থাকছে না। কাকাবাবুকে ধাক্কা মারতে মারতে বলতে লাগল, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো।

প্রায় ষাট-সত্তর ধাপ ওঠার পর একটা চাতাল। একটা অসমাপ্ত বাড়ি। মনে হয় যেন একটা হোটেল, এখনও চালু হয়নি, চাতালটায় পাথর, সিমেন্ট, গ্রিল ছড়ানো রয়েছে। এখান থেকে দিনের বেলা নিশ্চয়ই অনেক বরফমাখা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়।

দোতলার একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে।

ওদের একজন টর্চ জ্বেলে সামনের দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর কাকাবাবুকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। কাকাবাবু একজন বাতিকগ্রস্ত বুড়োর মতন বলতে লাগলেন উফ, উফ, আর পারি না! আর পারি না!

আলো-জ্বলা ঘরটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এদের একজন সেই দরজায় টোকা মারতেই ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, হু ইজ ইট?

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, সেম পার্টি।

এবার দরজা খুলে দিল একজন বেঁটেমতন লোক।

ঘরে অন্য কোনও আসবাব নেই, একটা ছোট টেবিল আর দুটি চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা দাবার ছক পাতা। দুজন লোক বসে এখানে দাবা খেলে সময় কাটাচ্ছিল। বেঁটে লোকটি ছাড়া অন্য লোকটি বেশ লম্বা-চওড়া, সুট-টাই পরা, মুখে চাপ-দাড়ি ও গোঁফ, এর চশমা নেই। মাথায় শিখদের মতন পাগড়ি, হাতে লোহার বালা। এই লোকটিকেই নেতা গোছের মনে হয়।

সে জিজ্ঞেস করল, মিশান কমপ্লিট?

অন্য লোক দুটি হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

পাগড়ি-পরা লোকটি চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে দিল, সকলে তাকে করমর্দন করল।

প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি এবার তার সঙ্গী আর ঘরের বেঁটে লোকটিকে বলল, তোমরা বাইরে গিয়ে পাহারা দাও।

কাকাবাবু ভেবেছিলেন, এখানে আরও অনেক আতঙ্কবাদীদের দেখতে পাবেন। কিন্তু সব মিলিয়ে মাত্র চারজন। এত টাকা পয়সার ব্যাপার বলেই বোধ হয় অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া আর কাউকে এরা সঙ্গে রাখে না। অনেক সময় বেশি টাকা দেখে মাথা খারাপ হয়ে এরা নিজেরাই মারামারি শুরু করে দেয়।

ওরা দুজনে চেয়ারে বসল। আর বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে থাকতে হল কাকাবাবুকে।

পাগড়ি-পরা লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, কাউন্ট দা ডো! কুইক!

দুটো চামড়ার ব্যাগই তালা দেওয়া। প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, চাবি?

কাকাবাবু এ-পকেট ও-পকেট খুঁজতে লাগলেন। ওপরে রেইন কোট, তার তলায় জ্যাকেট, তার তলায় শার্ট। অনেক পকেট, চাবি আর খুঁজে পাওয়াই যায় না।

অতি কষ্টে একটা চাবি শেষপর্যন্ত পেয়ে কাকাবাবু সেটা এগিয়ে দিলেন।

প্রথম দাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি সেই চাবি দিয়ে ব্যাগ খুলতে গেল। চাবি লাগল না। দু-চারবার চেষ্টা করার পর বোঝা গেল, সেটা ভুল চাবি।

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললেন, এই রে, ওটা আমার বাড়ির আলমারির চাবি। এই চাবি দুটো গেল কোথায়? ফেলে এলাম নাকি?

প্রথম দাড়িওয়ালা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস করে কাকাবাবুর গালে একটা চড় কষিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কুত্তার বাচ্চা, তুমি আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছ এখানে?

কাকাবাবু বললেন, মারবেন না, আর মারবেন না। এবার ভাল করে খুঁজছি। আমার কি এত লক্ষ-কোটি টাকা নিয়ে চলাফেরা করার অভ্যেস আছে? দেখুন না, আমার হাত কাঁপছে।

এবার কয়েকটা পকেট খুঁজে কাকাবাবু অন্য একটা চাবি বার করলেন।

সেটা লাগাতেই একটা ব্যাগ খুলে গেল। প্রথমেই একটা সাদা কাগজ। প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটিকে দ্রুত সেটা সরিয়ে ফেলতে দেখা গেল, ভেতরেও দিস্তে-দিস্তে সাদা কাগজ। একটা টাকাও নেই।

দুজন লোকই কাকাবাবুর দিকে রক্তচক্ষে তাকাল।

কাকাবাবু ফ্যাকাসে মুখে বললেন, এই রে? ভুল ব্যাগ দিয়ে দিল নাকি? আমি তো কিছু জানি না, আমি তো আর ব্যাগ খুলে দেখিনি।

প্রথম দাড়িওয়ালা তার অস্ত্র তুলে কাকাবাবুকে মারতে আসতেই তিনি বললেন, আগেই অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? অন্য ব্যাগটা খুলে দেখুন হয়তো ওটার মধ্যেই সব টাকা আছে।

প্রথম দাড়িওয়ালা এবার দ্বিতীয় ব্যাগটা খুলে ফেলল।

সেটার মধ্যেও শুধু সাদা কাগজ। ওপরের কাগজটায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, টিট ফর ট্যাট!

কাকাবাবু হা-হা করে হাসতে গিয়ে ওদের রাগে গনগনে মুখ দেখে চেপে গেলেন।

পাগড়ি-পরা শিখটি বলল, উই আর ডিউণ্ড! এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

প্রথম দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, এই খোঁড়াটাকে নিয়ে কী করব? একে শেষ করে দিই?

কাকাবাবু বললেন, না, না, আমাকে মেরে কী করবে? আমি তো সামান্য একজন দূত মাত্র। দূত অবধ্য, তা জানো না?

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, এই খোঁড়াটাকেও আমাদের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলো বরং। আবার চিঠি পাঠাও যে, টাকা না পেলে একেও ছাড়া হবে না।

কাকাবাবু বললেন, আমার জীবনের কোনও দাম নেই। আমাকে বন্দি করলে কেউ এক টাকা দিয়েও ছাড়াতে যাবে না।

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, এর হাত দিয়েই চিঠি পাঠানো যাক। আর তিনদিন সময় বাড়িয়ে ফাইনাল আলটিমেটাম। টাকা না পেলে সাইমন বুবুম্বার চর খুন হবে?

কাকাবাবু বললেন, তাতেও বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। ভারত সরকারের টাকার টানাটানি চলছে। এক কোটি ডলার দিতে পারবেনা!

পাগড়ি-পরা লোকটি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, তবে সাইমন বুবুম্বা খুন হবে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি যাও, গিয়ে তোমার সরকারকে এই কথাটা জানিয়ে দাও।

কাকাবাবু বললেন, সাইমন বুবুম্বা তো সোনার হাঁস। তাকে খুন করলে কি আর টাকা পাওয়ার কোনও আশা থাকবে? তা ছাড়া, সাইমন বুবুম্বা খুব চালাক লোক। তাকে খুন করা সহজ নয়। কে তাকে খুন করতে যাবে?

পাগড়ি-পরা লোকটি বলল, আমি। আমি নিজের হাতে তাকে খুন করব।

কাকাবাবু বললেন, অসম্ভব! তোমার পক্ষে সাইমন বুবুম্বাকে খুন করা অসম্ভব। তুমি বড়জোর আত্মহত্যা করতে পারো। কিন্তু তুমি তাকে কিছুতেই খুন করতে পারবে না। কারণ, তুমি নিজেই মহামান্য সাইমন বুবুম্বা। ভারত সরকারের বিশিষ্ট অতিথি!

একটুক্ষণের জন্য দুজনেই থ হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, তুমি যতই পাঞ্জাবি শিখের ছদ্মবেশ ধরে থাকো, তোমার উচ্চারণই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। খাঁটি অক্সফোর্ডের ইংরেজি। তুমি টাকাকে বললে ডো (□□□□□)। এখানে সবাই মানি বলে। এই লোকটি অসমের। অন্য যে-লোকটি ছিল সে অন্ধ্রপ্রদেশের। উচ্চারণ শুনে কে কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারি।

প্রথম দাড়িওয়ালা বলল, এই লোকটা বড্ড বেশি জেনে গেছে। একে খতম করে দিতেই হবে!

সাইমন বুবুম্বা বলল, ফিনিশ হিম?

প্রথম দাড়িওয়ালা তার ওভারকোটের পকেট থেকে অস্ত্রটা বার করতে লাগল।

কাকাবাবু যেন সত্যিই এবার ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর আত্মরক্ষার কোনও অস্ত্র নেই। তাঁর সারা শরীর বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল। তিনি অসহায়ভাবে বুকের কাছে হাত এনে রেইন কোটের একটা বোতাম ঘোরাতে লাগলেন।

প্রথম দাড়িওয়ালা তার দিকে অস্ত্রটা তুলতেই কাকাবাবুর মুখটা আবার বদলে গেল। জ্বলে উঠল দু চোখ। ঠাণ্ডা কঠিন গলায় তিনি বললেন, ব্লাড়ি ফুল, তুমি কাকে মারতে যাচ্ছ? এই লোকটা বিদেশি, কিন্তু তুমি তো আমাদের দেশের লোক। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তুমি আমাকে চেনো না? আমাকে মারা অত সহজ? ভেবেছ আমি তৈরি হয়ে আসিনি!

কাকাবাবুর দৃষ্টিতে সম্মোহন আছে। প্রথম দাড়িওয়ালার মাথাটা একবার বোধ হয় ঝিমঝিম করে উঠল। মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে সেটা কাটিয়ে বলল, কে রাজা রায়চৌধুরী? আমি চিনি না। তখন থেকে কথা বাড়িয়ে তুমি আমাদের ভাঁওতা দিচ্ছ।

সাইমন বুবুম্বা বলল, কিল হিম!

কাকাবাবু রেইন কোটের ওপরের বোতামটায় জোরে চাপ দিলেন। সেটা থেকে বিপ, বিপ, বিপ শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, এটা কী জানো না? এটা একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার। অন্তত তিনটে ওয়ারলেস ভ্যান এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে, তারা জানে আমি ঠিক কোন জায়গাটায় আছি। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এই জায়গাটা কমান্ডো ফোর্স ঘিরে ফেলবে। তার মধ্যে আমাকে মেরে পালাতে পারবে?

প্রথম দাড়িওয়ালা কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রেইন কোটের বোতামটা এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল। তারপর মাটিতে সেটাকে ফেলে নিজের অস্ত্রের কুঁদো দিয়ে দুমদুম পিটতে লাগল।

বোতামটা ভেঙে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট ব্যাটারি দেওয়া যন্ত্র।

লোকটি মুখ তোলার আগেই কাকাবাবু একটা ক্রাচ ঘুরিয়ে দারুণ জোরে মারলেন তার হাতে। তার অস্ত্রটা ছিটকে চলে গেল ঘরের কোণে।

কাকাবাবু অবশ্য সেটা ধরতে পারলেন না। লোকটাই ঝাপিয়ে পড়ল সেটার ওপর।

তখনই বাইরে শোনা গেল সাব মেশিনগানের গুলির শব্দ।

কাকাবাবু বলে উঠলেন, যান, সাত মিনিটও লাগল না। ওরা এসে গেছে!

প্রথম দাড়িওয়ালা অস্ত্রটা তুলে এবার আর কাকাবাবুকে মারতে গেল না। সে চট করে অস্ত্রের মুখটা সাইমন বুবুম্বার গলায় চেপে ধরল।

তারপর হিংস্রভাবে বলল, আমাকে ধরতে পারবে না। আমি এই সাহেবকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমাকে ধরার চেষ্টা করলেই একে আমি গুলি করব।

সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র ভার্মা, তাঁর পাশে সাব মেশিনগান হাতে একজন কমান্ডো সেনা।

নরেন্দ্র ভার্মা দাড়িওয়ালা লোকটিকে ওই অবস্থায় দেখে বললেন, কটা গুলিতে ওর বডিটা ছুঁড়ে দেব? দশটা, না পনেরোটা?

লোকটা খ্যাপার মতন চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার, আমাকে মারার চেষ্টা করা হলেই আমি একে আগে মারব। পথ ছেড়ে দাও, আমাদের বেরিয়ে যেতে দাও।

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, না! তুমি ওকে গুলি করতে চাও, করো। ওকে মারো। তাতে এখন আর আমাদের কিছু যাবে-আসবে না। সাইমন বুবুম্বা নিজেই আমাদের সিকিউরিটির চোখ এড়িয়ে পালিয়েছে। তারপর রটিয়ে দিয়েছে যে বিপ্লবীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আসলে মুক্তিপণের এক কোটি ডলার ও নিজেই নেওয়ার মতলবে ছিল। তোমাদের মতন কয়েকটা বিপ্লবী দলের সাহায্য নিয়েছে, এখানে-ওখানে দু-একটা নকল সাইমন বুবুম্বা সাজিয়ে পুলিশের চোখকে ধুলো দিতে চেয়েছে। এখন ও মারা গেলেও আমরা প্রমাণ করব, নিজের দোষে মরেছে।

সাইমন বুবুম্বা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। কোনও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু প্রথম দাড়িওয়ালাকে ধমকে দিয়ে বললেন, দেরি করছ কেন, ওকে মারো। তাতে আমাদের অনেক ঝামেলা চুকে যায়। তারপর কিন্তু তুমি আর কাল সকালের সূর্যের আলো দেখতে পাবে না। এখনও ধরা দিলে তবু প্রাণে বাঁচতে পারো।

কমান্ডোটি নিজের সাব মেশিনগান তুলে বলল, কে আগে গুলি করবে?

প্রথম দাড়িওয়ালাটি এবার তার হাতের অস্ত্র ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে আর-একজন এসে বেঁধে ফেলল তার হাত।

নরেন্দ্র ভার্মার পাশ দিয়ে সন্তু ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, তোমার কিছু হয়নি তো? ওরা তোমাকে মারেনি তো? ওঃ, এতক্ষণ ধরে..।

কাকাবাবু বললেন, না রে, আমার কিছু হয়নি। আমার চোখের দিকে তাকালে কেউ আর আমাকে গুলি করতে পারে না, আমি লক্ষ করেছি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, চেহারায় তো মিলছে না। সাইমন বুবুম্বার দাড়ি-গোঁফ নেই। এদের দুজনেরই দেখছি ঘন দাড়ি। ছদ্মবেশ? কোনজন আসল সাইমন বুবুম্বা?

কাকাবাবু বললেন, নকল দাড়ি-গোঁফ বোঝাই যাচ্ছে। আমি দেখছি।

তারপর তিনি হঠাৎ প্রথম দাড়িওয়ালাটির দাড়ি ধরে এক টান দিলেন। সে আঁ-আঁ করে চিৎকার করে বলে উঠল, আমারটা নকল না, নকল না..

কাকাবাবু তবু ছাড়লেন না। লোকটার আসল দাড়ি হলেও এক মুঠো উপড়ে তুলে আনলেন। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

কাকাবাবু তেতো গলায় বললেন, এ আমাকে চড় মেরেছিল। আমাকে খুন করার জন্য অস্ত্র তুলেছিল। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমার দিকে অস্ত্র তুলবে, তাকে আমি কিছু না কিছু শাস্তি দেবই! এরা সামান্য টাকার জন্য একজন বিদেশির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এরা:তো পাঁচ-দশ লাখ টাকা পেলেই খুশি। সাইমন বুবুম্বা এক কোটি ডলার আদায় করার তালে ছিল, তার থেকে বিশ-পঁচিশ লাখ খরচ করাও কিছুই না।

তারপর তিনি সাইমন বুবুম্বার দিকে চেয়ে বললেন, কী, তোমার দাড়ি-গোঁফও টেনে খুলতে হবে নাকি?

সাইমন বুবুম্বা এবার নিজেই দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলল।

একজন কমান্ডো অমনই তার পাশে গিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল।

সাইমন বুবুম্বা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খবর্দার, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে। আমার ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি আছে। আমি আমার দেশের প্রতিনিধি।

কাকাবাবু বললেন, ফের বড়-বড় কথা! তুমি বাধা দিলে তোমাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে সার্চ করা হবে।

সাইমন বুবুম্বা নিজেই কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট কোল্ট রিভলভার বার করে বলল, এটা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই।

কমান্ডোটি তবু অন্য পকেটটাও দেখল। সেখানে রয়েছে শুধু একটা চকোলেট বার।

কাকাবাবু বললেন, এবার চেহারা মিলেছে তো?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, উফ বাবা! পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত!

কাকাবাবু বললেন, কী রে সন্তু, এর আবার টিকিফিকি নেই তো? ভাল করে দেখে নিয়েছিস?

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আমি একবার সাইমন বুবুম্বাকে সার্চ করে দেখতে পারি? কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, কেন? ওর কাছে আরও অস্ত্র লুকনো আছে নাকি?

সন্তু বলল, তবু আমি একবার দেখতে চাই। আমার একটা সন্দেহ। হচ্ছে।

কাকাবাবু নরেন্দ্র ভার্মার দিকে তাকালেন। নরেন্দ্র ভার্মা মাথা নেড়ে বললেন, গো অ্যাহেড, সনটু!

সন্তু এগিয়ে যেতেই সাইমন বুবুম্বা চিৎকার করে উঠল, না, না, আমাকে ছোঁবে না। আমার ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি আছে। তোমাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে!

নরেন্দ্র ভার্মা দুজন কমান্ডোকে ইঙ্গিত করলেন, তারা দুদিক থেকে সাইমন বুবুম্বার হাত চেপে ধরল শক্ত করে।

সন্তু ওর সারা শরীর থাবড়ে-থাবড়ে দেখতে লাগল। পেটের কাছে শক্ত কিছুতে হাত ঠেকতেই সাইমন বুবুম্বা দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল আর-একবার। সন্তু ওর ওভারকোটের বোতাম খুলে, ভেতরের জামা খুলে একটা ছোট ভেলভেটের বাক্স টেনে বার করল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সাবধান, ওর মধ্যে বোমা-টোমা আছে নাকি?

কোনও দ্বিধা না করে সন্তু বাক্সটা খুলে ফেলল, ভেতরের জিনিসটা দেখে হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। সে বলল, এই নাও, চাঁদের পাথর!

কাকাবাবু বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, অ্যাঁ?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হোয়াট?

দুজনেই দেখলেন, ওরকম একটা দামি বাক্সের মধ্যে রয়েছে একটা সাধারণ চেহারার পাথর। তার একটা কোণ সদ্য ভাঙা হয়েছে!

কাকাবাবু বললেন, এর সাইজ আর শেপ তো চাঁদের পাথরের মতনই। কলকাতা থেকে যেটা চুরি গেছে। তুই এটা কী করে আন্দাজ করলি রে, সন্তু? চাঁদের পাথরটার ব্যাপার

তো আমার মাথাতেই ছিল না। সাইমনের সঙ্গে ওই চুরির কোনও যোগ থাকতে পারে, তাও আমি একবারও ভাবিনি।

সন্তু বলল, ওর হাতের আংটিটা দ্যাখো?

সাইমনের হাতে একটা মাত্র আংটি। তার মাঝখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো সাধারণ পাথর বসানো।

সন্তু বলল, জোজোর কাছে শুনেছি, ইনি যাতে তাড়াতাড়ি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, সেইজন্য জোজোর বাবা এঁকে একটা মুনস্টোনের আংটি ধারণ করতে দিয়েছিলেন। মুনস্টোন তো হলদে-বাদামি, চকচকে পাথর। এঁর আংটির পাথরটা সেরকম নয়। তাইতে আমার সন্দেহ হল। ইনি বোধ হয় ভেবেছেন, আসল চাঁদের পাথর দিয়ে আংটি পরলে আরও বেশি কাজ হবে।

কাকাবাবু বললেন, সেইজন্য চাঁদের পাথরটা নিজে চুরি করেছে কিংবা টাকা দিয়ে চুরি করিয়েছে! তুই ঠিক ধরেছিস তো, সন্তু! তোর তো সাঙ্ঘাতিক চোখ হয়েছে। আমরা কেউ লক্ষই করিনি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, ব্রাভো, সন্তু, ব্রাভো। চাঁদের পাথরটা পাওয়া গেল, আমেরিকার কাছে আমাদের মুখরক্ষা হবে। এ যে দারুণ ব্যাপার। রাজা, সন্তুর যেরকম চোখ আর বুদ্ধি হয়েছে, তাতে কালে কালে ও তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে!

কাকাবাবু বললেন, তাই তো দেখছি!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, ওঃ, যা আনন্দ হচ্ছে আমার! কাল সকলেই এঁকে দিল্লি নিয়ে যেতে হবে স্পেশ্যাল প্লেনে!

সাইমন বুবুম্বা এবার বলে উঠল, আমাকে এখানকার কোনও হোটেলে নিয়ে চলো। আমি এখন দিল্লি যাব না। এখানে বিশ্রাম নেব।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, দিল্লি গিয়ে চুক্তিটা সই করবেন, তারপর যত খুশি বিশ্রাম নেবেন।

সাইমন বুবুম্বা বলল, আমি তোমাদের দেশের সঙ্গে চুক্তিতে সই করব।

নরেন্দ্র ভার্মা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, সই করবেন না মানে? আপনাকে আমি ঘাড় ধরে দিল্লি নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে চুক্তিটা সই করবার পর আমার। শান্তি হবে!

সাইমন বুবুম্বাও তেজের সঙ্গে বলে উঠল, আমি সই না করলে, আমাকে দিয়ে জোর করে সই করাবে? দেখি কেমন পারো!

কাকাবাবু বললেন, না, জোর করে সই করানো যায় না! দশ মিলিয়ান ডলার ফসকে গেল বলে বুঝি আর সই করতে চাও না? ঠিক আছে, সই কোরো না! কিন্তু তা হলে তুমি দেশে ফিরতেও পারবে না। চাঁদের পাথর চুরি করাটাই একটা বিরাট অপরাধ। তা ছাড়া ভারত সরকারকে দশ মিলিয়ন ডলার ঠকাবার ষড়যন্ত্রের জন্যও তোমার বিচার হবে। অন্তত দশটি বছর জেল হবে নির্ঘাত। তোমার দাদা, প্রেসিডেন্ট বুবুম্বাকে জানানো হবে সব কথা। তোমাকে জেলে পাঠালে আশা করি তিনি খুশিই হবেন। তোমার আর পরের বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানো হবে না।

সাইমন বুবুম্বা এবার লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, এখন চলুন। আপনাকে আর কী বলব। দু বছর আগে টার্কিতে আপনি এই একই কায়দায় দু কোটি ডলার আদায় করেছিলেন, ইচ্ছে করে এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নিয়েছেন নিজেই। টার্কিতে তো রাজা রায়চৌধুরী নেই। এখানে আপনার জারিজুরি কিছুই খাটল না শেষপর্যন্ত। রাজা রায়চৌধুরী সব বানচাল করে দিল।

কাকাবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে যাঃ, আমি আর এমন কী করেছি! চাঁদের পাথরটা তো বার করল সন্তুই। তারপর তুমি দলবল নিয়ে ঠিক সময়ে এসে গেলে, নেপাল সরকার সবরকম সাহায্য করল, সেইজন্যই তো এদের প্ল্যান ভেস্তে গেল!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তা ঠিক। তুমি কিছুই করোনি! তুমি একা এদের কাছে এলে, ব্যাগের মধ্যে সাদা কাগজ ভরে... অন্তত আমার তো এত সাহস হত না!

এর দুদিন পরে টিভিতে দেখানো হল যে মুরুণ্ডির সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই হল দিল্লিতে। সই হওয়ার পর সাইমন বুবুম্বা আর আমাদের অর্থমন্ত্রী করমর্দন করে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন ক্যামেরার দিকে। পটাপট অনেক ছবি উঠল। এই চুক্তি সইয়ের পেছনে যে কত কাণ্ড ঘটেছে, তা কেউ জানল না, খবরের কাগজেও কিছু ছাপা হল না।

এরও এক মাস পরে কাকাবাবু একটা চিঠি পেলেন দিল্লির এক দূতাবাস থেকে। মুরুন্ডির রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন যে, তিনি তার দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এই চিঠি লিখছেন। প্রেসিডেন্ট জানাতে বলেছেন যে, তার ভাই সাইমন বুবুম্বা ভারতে এসে কী কী অপকীর্তি করেছে, তা ভারত সরকার না জানালেও তিনি জানতে পেরেছেন অন্য সূত্র থেকে। সেজন্য তিনি মর্মান্তিক দুঃখিত। সাইমন বুবুম্বার কাছ থেকে সমস্ত সরকারি ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এও জেনেছেন যে, প্রধানত মিঃ রাজা রায়চৌধুরীর চেষ্টাতেই সাইমন বুবুম্বার ওইসব অপচেষ্টা, নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য প্রেসিডেন্ট মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট তার দেশে আমন্ত্রণ জানাতে চান। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী যদি সপরিবারে এক মাসের জন্য মুরুণ্ডিতে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে থেকে যান, তা হলে প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হবেন।

সন্তু আর জেজো তখন পাশের ঘরে ক্যারাম খেলছে।

কাকাবাবু চিঠিখানা ওদের পড়ে শোনালেন। তারপর বললেন, শেষের প্রস্তাবটা মন্দ না। শুনেছি মুরুন্ডি দেশটা ছোট্ট হলেও খুব সুন্দর। ওদের পয়সায় ওখানে কিছুদিন বেড়িয়ে এলে বেশ হয়। এবার আর কোনও চোর-ছাঁচোড় কিংবা খুনে-গুণ্ডার পেছনে ছোটাছুটি নয়। শুধু ভ্রমণ আর বিশ্রাম। কী রে, যাবি নাকি সন্তু?

সন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ, যাব। তুমি ওদের শিগগির লিখে দাও।

জোজোও বলে উঠল, আমিও যাব। আমাকেও নিয়ে চলুন কাকাবাবু। আমি কখনও আফ্রিকায় যাইনি?

সন্তু অবাক হয়ে, বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে।